লোকমাতা নিবেদিতা

মনি বাগচি

"পশ্চিমের এ-ফুল আমার নরেন এনেছে
ঠাকুরের নৈবেদ্য দেবে বলে।"—শ্রীসারদাদেবী

LOKMATA NIVEDITA

A Biography of

Sister Nivedita

By : Moni Bagchee

লোকমাতা নিবেদিতা

মনি বাগচি

সুতপা প্রকাশনী
কলিকাতা-২৩

স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
ও
ভগিনী নিবেদিতার পরম স্নেহাস্পদ,
ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের পুণ্য স্মৃতিতে

নিবেদিতা

তুমি বুঝি ভারতের শাপভ্রষ্ট তাপসী তনয়া
তাই তব তার তরে এত ভক্তি, এত স্নেহ-মায়া ?
তাই বুঝি সে-বন্ধন জন্ম হ'তে যায় জন্মান্তরে
রুধিয়া রাখিতে নারে দেশান্তরে পর্বতে সাগরে।
সযতনে সঙ্গোপনে অন্তরের পূত অর্ঘ্য নিয়া
সুদূর পশ্চিম হতে জাতিগর্বে জলাঞ্জলি দিয়া
এলে তুমি, ভারতের বেদীমূলে হলে সমর্পিতা
ক্ষীণ তনু, শুভ্র শান্ত, দেবী তুমি, তুমি নিবেদিতা।
গুরুর ভারতমন্ত্র জপমন্ত্র ছিল অনিবার
জানিয়া দেখিয়াছিলে কী নয়নে কী মূরতি তাঁর ?
তুমি কি ভাবিয়াছিলে ভারতের প্রতি দিকে দিকে
দেবতারা খেলা করে ? শিব ভালোবাসিছে গৌরীকে ?
বুদ্ধ আজো ধ্যানে বসি ফল্গুতীরে বোধিতরু তলে ?
ইন্দ্রদেব বৃত্রাসুরে বজ্র হানে দধীচির বলে ?
তুমি কি ভাবিয়াছিলে ভারতের অরণ্যের মাঝে
ঋষিদের বেদগান সন্ধ্যারাগে সামসুরে বাজে ?
তুমি কি দেখিয়াছিলে ভারতের অণু-পরমাণু
গিরি গুহা শিখর প্রান্তর নদনদী বনস্থাণু
সবই দেবময় ? ভারতের কৃশ নগ্ন অর্ধমৃত
জীবচয়,—তারাও দেবতা তব হলো নির্বাচিত।*

* 'উদ্বোধন' থেকে উদ্ধৃত।

সে আজ দশ বছর আগের কথা।

'উপেক্ষিত নিবেদিতা'—এই শিরোণামায় একখানা চিঠি প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক যুগবাণী পত্রিকায়। 'শ্রীশোভা রায়'—এই ছদ্মনামে চিঠিখানা লিখেছিলাম আমি। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ঐ চিঠিখানি পুনর্মুদ্রিত হয়। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠিখানা—বিশেষ করে দুইজনের। তাঁদের মধ্যে একজন বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক, স্যর যদুনাথ সরকার এবং অন্যজন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—আমার শ্রদ্ধেয় 'ভূপেনদা'। নিবেদিতার একখানি প্রামাণ্য জীবন-চরিত লিখবার সংকল্প আমার তখন থেকেই। তখনো পর্যন্ত কোনো বাঙালী সাহিত্যিক নিবেদিতা-সম্পর্কে চিন্তা করেন নি। একদিন দেখা করলাম আচার্য যদুনাথের সঙ্গে, বললাম সব কথা তাঁকে। তিনি উৎসাহ দিলেন, উপদেশ দিলেন এবং নিজের পুরানো 'নোট' বই থেকে বহু উপকরণও দিলেন আমাকে। 'নিবেদিতা' ও 'Sister Nivedita' রচনার ইহাই নেপথ্য ইতিহাস।

আর দুই বছর পরেই ভগিনী নিবেদিতার জন্ম শতবার্ষিকী। তাঁর বিষয়ে আরো আলোচনার প্রয়োজন আছে বিবেচনা করেই সাধারণ পাঠকদের জন্য স্বল্পমূল্যের এই বইখানি লেখা হয়েছে।

৯০, বাগুইআটি রোড,
দমদম, কলিকাতা-২৮

মণি বাগচি

॥ আমাদের অন্যান্য বই ॥

বাংলার বাঘ আশুতোষ
সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী
সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক
ইন্দ্রনীলা
অচেনা আকাশ
মোহ থেকে মুক্তি
মুক্তিস্নান
বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে
সাপ
কেমন করে এল এরা
জননায়ক জওহরলাল

॥ পরবর্তী বই ॥

দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র
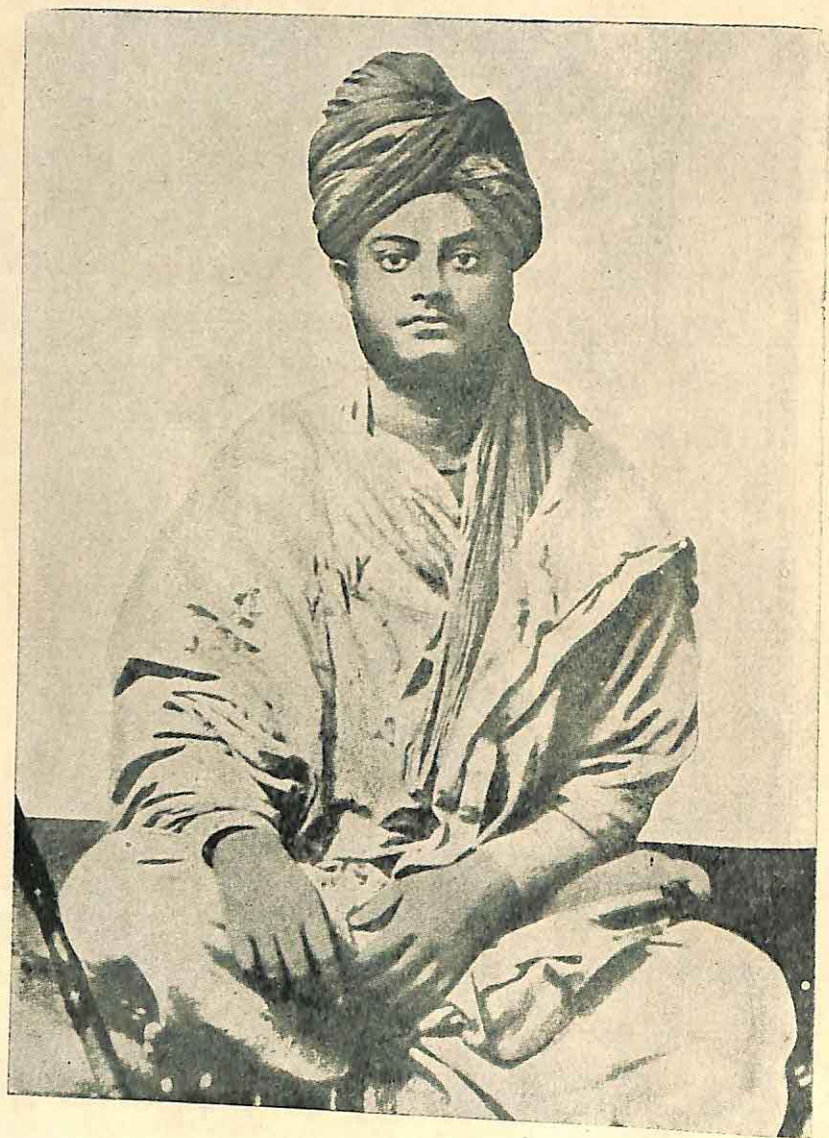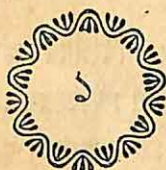
লোকমাতা নিবেদিতা।

এই সুন্দর আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এক মহীয়সী বিদেশিনী মহিলাকে। এই বিদেশিনী মহিলা স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা নিবেদিতা।

ভগিনী নিবেদিতা একান্তভাবেই ভারত-সেবিকা—ভারতের বেদীমূলে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন পরিপূর্ণ ভাবে। ভারতবাসীর কাছে, বিশেষ করে বাঙালীর কাছে, ভারত-সেবিকা ভগিনী নিবেদিতার পুণ্যস্মৃতি তাই চির অম্লান শুচি-শুভ্র আর ত্যাগ-পূত। এই মহাজীবনের কাহিনী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়।

বাংলার একজন কবি বলেছেন: "ওগো দেবতার-দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী।" সত্যই নিবেদিতা তাই ছিলেন। দেবতার দান। দেবতার আশীর্বাদ।

আর একজন কবি বলেছেন:

এই ভারতের বেদীমূলে তুমি চির-সমর্পিতা।
ক্ষীণ তনু শুভ্র-শান্ত, দেবী তুমি, তুমি নিবেদিতা॥
ভারতবর্ষের পূর্ণ গৌরব বহন করেন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।
আর বিবেকানন্দের পূর্ণ গৌরব বহন করেন নিবেদিতা।

বিবেকানন্দকে না জানলে যেমন ভারতবর্ষের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না, তেমনি নিবেদিতাকে না জানলে স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না।

নিবেদিতার চরিত্র-মহিমা বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "নিবেদিতা ছিলেন লোকমাতা। ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁর প্রীতি একান্ত সত্য ছিল। মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছিলেন, স্বয়ং তাদেরই সেবায় তিনি তাঁর জীবনকে সার্থক করেছিলেন।"

উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের টাইরন প্রদেশ। ঝোপে-ঝাড়ে ভরা জংলা মেঠো দেশ, ওরই মাঝে ছোট্ট একটি শহর—ডাঙ্গানন। এইখানে বাস করতেন পরম ধার্মিক এক তরুণ দম্পতি। স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোবল আর তাঁর স্ত্রী মেরি ইসাবেল। স্যামুয়েল ছিলেন স্থানীয় একটি গির্জার ধর্মযাজক। আবার আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গেও তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। টাইরনে নোবল পরিবারের খুব সুনাম ছিল। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এই পরিবারের নাম অক্ষয় হয়ে আছে। স্যামুয়েলের পিতা রেভারেণ্ড নোবল ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী। স্বাধীনতা লাভের জন্য ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আইরিশরা বহুকাল ধরে সংগ্রাম করেছিল—টাইরনের বহু বীর এই সংগ্রামে শোণিত দান করে অমর হয়েছেন—টাইরনের বহু বিপ্লবীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল স্বাধীনতার অগ্নি-মন্ত্র। রেভারেণ্ড নোবল ছিলেন তাঁদেরই একজন।

মার্গারেটের মায়ের নাম মেরি হ্যামিলটন নোবল। সবাই তাঁকে ডাকতো ইসাবেল বলে। ইসাবেল ছিলেন পরমাসুন্দরী। উপাসনা আর প্রার্থনার সুর ঝংকৃত হোত তাঁর জীবনের বীণার তারে তারে।

ইসাবেলের প্রথম সন্তান মার্গারেট। মার্গারেটের জন্মের সময় তাঁর মায়ের বয়স খুব বেশি ছিল না। মায়ের রূপলাবণ্য নিয়েই মেয়ের জন্ম।

১৮৬৭ সাল, ২৮শে অক্টোবর।

শরতের সেই সোনালি প্রভাতে মায়ের বুকে এলো তাঁর প্রথম সন্তান। কথিত আছে, কন্যার জন্মের সময়ে স্যামুয়েল-পত্নী আকুল কণ্ঠে দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেন ঃ "প্রভু, যদি নিরাপদে আমার সন্তানের জন্ম হয়, তাহোলে তোমার চরণেই আমি তাকে নিবেদন করব।"

অন্তর্যামী দেবতা শুনেছিলেন মায়ের অন্তরের সেই প্রার্থনা।

তারপর ঐদিন—২৮শে অক্টোবর—বিহঙ্গের মৃদু কলরবে সুপ্তা ধরণীর নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হোলেন শিশু মার্গারেট। সূতিকাগারে গিয়ে ঠাকুরমা দেখলেন, মেয়ে তো নয়, যেন চাঁপার কলি। নবজাত শিশুর অনিন্দ্যসুন্দর মুখকান্তি আর তার নীল আয়ত চোখ দুটি দেখে স্যামুয়েল-দম্পতির মনে আনন্দ আর ধরে না।

ইসাবেল মনে মনে দেবতার চরণে নিবেদন করলেন মেয়েকে।

ঠাকুরমা নাতনীর নাম রাখলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল।

মায়ের রূপের সঙ্গে উত্তরাধিকারসূত্রে পৌত্রী মার্গারেট তাঁর ঠাকুরদাদার স্বদেশপ্রেমও লাভ করেছিলেন পূর্ণমাত্রায়।

মার্গারেটের পর স্যামুয়েল-দম্পতির আর একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। এর কিছুকাল পরেই নোবল-পরিবার ডাঙ্গানন ত্যাগ করে ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার শহরে এসে বসবাস করতে থাকেন। স্যামুয়েল তাঁর পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং তাঁর মতন তিনিও ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট শ্রেণীর একজন ধর্মযাজক। তিনিও স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন।

সুতরাং একটি ধার্মিক এবং স্বদেশপ্রেমিক পরিবারেই জন্ম হয়েছিল মার্গারেটের। এর ফলে উত্তরকালে এই ধর্ম আর স্বদেশ-

প্রেম—দুই-ই ফুটে উঠেছিল তাঁর জীবনে। শৈশবে ঠাকুরমায়ের কাছেই মানুষ হয়েছিলেন মার্গারেট। ঠাকুরমায়ের নামের সঙ্গে মিলিয়েই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। দিনে দিনে মার্গারেট বড় হয়ে ওঠেন। ঠাকুরমায়ের বাগান-ঘেরা বাড়িটিতে অনাবিল আনন্দেই অতিবাহিত হোত মার্গারেটের শৈশবের ভাবনাহীন দিনগুলি। মার্গারেট তাঁর ঠাকুরমাকে যেমন ভালো-বাসতেন, তেমনি শ্রদ্ধা করতেন। মার্গারেটও ছিলেন যেন তাঁর চোখের মণি। সব সময়ে নাতনী থাকতেন তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতন, ঘুরতেন তাঁর পায়ে-পায়ে।

ঠাকুরমার প্রিয় গ্রন্থ ছিল বাইবেল। এ ছিল তাঁর নিত্যপাঠ্য। ঠাকুরমায়ের কোলে বসে বাইবেল শুনতেন মার্গারেট। ঈশ্বরের সন্তান যীশুর অমিয়বাণী শিশুর অন্তরে আঁকা হোয়ে যায় সেই বয়সেই। প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যাবেলায় বাইবেলের বাণী ভজনের সুরে পাঠ করতেন তিনি; তাই শুনে-শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল মার্গারেটের। ঠাকুরমায়ের সঙ্গে নাতনীও সুন্দর সুমিষ্ট কণ্ঠে বলে যেতেন সেগুলি।

জীবনের প্রথম চার-পাঁচ বছর ঠাকুরমায়ের স্নেহে ও আদরে কেটে গেল মার্গারেটের। সেই বয়সেই সাধু যোহনের 'সুসমাচার' মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল তাঁর—এমনি ছিল শিশুর স্মরণশক্তি। আরো একটু বড়ো হোলে দুই বোনকে একটা স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। স্কুলেই তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই সময়ে একদিন দেশ থেকে খবর এলো ঠাকুরমা মারা গেছেন। ঠাকুরমায়ের মৃত্যুসংবাদে বালিকা মার্গারেট চোখের জল ফেললেন না, শুধু তাঁর সমস্ত অন্তরটা যেন পাথরের মতন ভারী হয়ে রইল।

কিছুকাল বাদে স্যামুয়েল এলেন একটা গ্রামে। গ্রামের স্নিগ্ধ ও শান্ত পরিবেশ মুগ্ধ করল বালিকাকে। মার্গারেটের বয়স তখন

দশ বছর। সেই বয়সে পিতার প্রতি কন্যার ভক্তি দেখে মায়ের আনন্দ ধরে না। পিতার সেবায় মার্গারেট তাঁর সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। বাইরে বেড়ানো বা সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধূলা ছেড়ে বালিকা সর্বক্ষণ তাঁর পিতার সঙ্গী হয়ে উঠলেন। বাপের কাছ ছাড়া হন না তিনি এক মুহূর্ত। গির্জায় যখন ভাষণ দিতে যান স্যামুয়েল, মেয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। আবার পিতার সঙ্গে একাসনে বসে উপাসনা করেন নিবিষ্ট চিত্তে। যে দেখে সেই প্রশংসা করে। ধর্মের কথা যেমন, তেমনি স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস যখন পিতার মুখে শুনতেন, তখন মার্গারেটের সমস্ত অন্তর যেন এক বিচিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হোত। পিতার কাছ থেকে আর একটা জিনিস পেয়েছিলেন তিনি—সহজ নেতৃত্ব আর একটা একরোখা ভাব। উত্তরকালে এই দুটি মার্গারেটের মধ্যে বিশেষভাবেই দেখা গিয়েছিল।

মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে স্যামুয়েলের মৃত্যু হোল। মৃত্যুশয্যায় স্যামুয়েলের মুখে এলো তাঁর আদরিণী কন্যা মার্গারেটের নাম। স্ত্রীকে ডেকে বললেন তিনি: "মার্গারেট পৃথিবীতে এসেছে একটা বড়ো কিছু করবার জন্যে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ভগবান যেদিন ওকে তাঁর কাজের জন্য ডাক দেবেন, সেদিন যেন বাধা দিও না।" পিতার এই ভবিষ্যদ্বাণী কন্যার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল।

পিতার মৃত্যুর পর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দুই বোন—মার্গারেট আর মে—হ্যালিফ্যাক্সের একটা বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তে এলেন। এই স্কুলের ছাত্রীদের বেশির ভাগই ছিল ধর্মযাজকদের মেয়ে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিস ল্যারেট। শাসনে ও স্নেহে তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষিকা। এঁর কাছ থেকে ছাত্রীজীবনে মার্গারেট শিক্ষা করেছিলেন দুটি জিনিস—স্বার্থত্যাগ আর সংযম। এইসময় থেকেই তাঁর জীবন গড়ে উঠেছিল এই উন্নত আদর্শের ভেতর দিয়ে। উত্তর কালে মার্গারেটের জীবন সার্থক হয়েছিল স্বার্থত্যাগ আর সংযমের

অনুশীলনে। একদিন ক্লাসে পড়াবার সময় মিস ল্যারেট বললেন তাঁর ছাত্রীদের: "তোমরা আজ ছেলেমানুষ আছ, কিন্তু একদিন তোমরা বড় হোয়ে উঠবে। তখন একটি কথা তোমরা সবাই মনে রেখো—"চরিত্রই মানুষের নিয়তি।"

"চরিত্রই মানুষের নিয়তি"। কী সুন্দর উপদেশ! সেদিন থেকে এই উপদেশটি মার্গারেটের মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গেল।

ছাত্রীজীবন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় মার্গারেটের কর্ম-জীবন। সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব এখন তাঁর ওপর। মা, ছোট বোন আর একটি ছোট ভাই—এই নিয়ে এখন তাঁদের সংসার। বুদ্ধিমতী মার্গারেট প্রথমে একটি স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিলেন। তিন বছর সেই স্কুলে কাজ করার পর তিনি একটি অনাথ আশ্রমের ভার নিলেন। এইখানে এক বছর কাটিয়ে তিনি আবার একটা স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করেন। শিক্ষয়িত্রী হয়েই তিনি জীবন কাটাবেন এই ছিল মার্গারেটের মনের ইচ্ছা। এইসময় থেকেই তাঁর মনে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে জাগল কৌতূহল। শিক্ষা-বিজ্ঞানে তখন এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে য়ুরোপে। শিক্ষয়িত্রী মার্গারেট নতুন উৎসাহে নব্য শিক্ষারীতির সঙ্গে পরিচিত হলেন। বুঝলেন শিশুর মনই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভের আসল ভিত্তি। লিভারপুলের একটা স্কুলে তিনি এ বিষয়ে ট্রেনিং নিলেন এবং তারপর উইম্বলডনের একটা শিশু-বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার চাকরি নিলেন। ছেলেদের জীবন ঠিকভাবে গড়ে তোলার কাজে তিনি উৎসর্গ করলেন নিজের জীবন।

নিজের মুক্তমনের সব কিছু আবেগ ঢেলে দিতেন মার্গারেট তাঁর ছোট-ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের মনে। তাদের মনে জাগিয়ে তুলতেন সহজভাবেই নতুন চেতনা। শিক্ষার সঙ্গে চলত উপাসনা—যেমন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের স্কুলে চলত শিক্ষার সঙ্গে উপাসনা।

এমনিভাবেই উপাসনা আর প্রার্থনার ভেতর দিয়ে তিনি গড়ে তুলতেন বালক-বালিকাদের নৈতিক জীবনের ভিত্তি। এইভাবে উইম্বলডনের ছোট্ট স্কুলটির কাজে ডুবে গেলেন মার্গারেট—আনন্দে ভরে উঠল তাঁর জীবন। তখন থেকেই তিনি লণ্ডনে বসবাস করতে থাকেন। কিছুকাল বাদে মার্গারেট নিজেই একটা স্কুল খুললেন; নাম দিলেন 'রাস্কিন স্কুল'। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন ইংলণ্ডে জন রাস্কিন নামে একজন বিশেষ জ্ঞানী ও চিন্তাশীল লেখক ছিলেন; একজন শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ্ হিসেবেই ছিল তাঁর খ্যাতি। ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর জন্ম। জনসাধারণ যাতে নিশ্চিন্ত মনে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায়, সেই চিন্তাতেই তিনি তাঁর জীবন কাটাতেন। রাস্কিনের চিন্তাধারা মার্গারেটকে খুব প্রভাবিত করে। 'চিন্তা এবং কর্মে সততা আর শিল্পচর্চায় সত্যের অনুশীলন—রাস্কিনের এই আদর্শ মার্গারেটকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে এবং সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যই তিনি তাঁর স্কুলের নাম রেখেছিলেন 'রাস্কিন স্কুল'।

মার্গারেটের স্কুলটি অল্পদিনেই বিখ্যাত হয়ে উঠল। আর সেই সঙ্গে একজন আদর্শ এবং আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের সঙ্গে সুপরিচিতা শিক্ষয়িত্রী হিসাবে কুমারী এলিজাবেথ মার্গারেট নোবলের নাম ছড়িয়ে পড়ল লণ্ডনের বিদগ্ধ সমাজে।

সেই সময় থেকেই তিনি দেশের রাজনীতি সম্পর্কেও চিন্তা করতে আরম্ভ করেন; লণ্ডনের বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর রাজনৈতিক রচনা প্রকাশিত হয় এবং সেখানকার শিক্ষিত মহলে তাই নিয়ে হয় আলোচনা। কে এই আইরিশ মহিলা যাঁর রচনা এমন স্বচ্ছ আর চিন্তা এমন বলিষ্ঠ?—জিজ্ঞাসা করে সবাই। লণ্ডনের অভিজাত মহিলাদের মধ্যে লেডি রিপনের তখন খুব নাম। রাস্কিন স্কুলের একজন শিক্ষিকার মাধ্যমে মার্গারেট একদিন পরিচিতা হলেন

এই লেডি রিপনের সঙ্গে। তারপর থেকে তাঁর ভবনে নিয়মিত আসা-যাওয়া আরম্ভ হয় মার্গারেটের। আরো অনেক বিশিষ্ট মহিলাই আসতেন এখানে। আলোচনা যা হোত তা শুধু শিল্প আর সাহিত্যের বিষয়কে কেন্দ্র করেই। এমনি করেই লেডি রিপনের বাড়ির এই আলোচনা বৈঠকটি অবশেষে পরিণত হয় একটি বিখ্যাত ক্লাবে—সিসেম ক্লাব।

লণ্ডনে তখন সিসেম ক্লাবের খুব নাম। শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং প্রগতিমূলক সকল রকম চিন্তা ও আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই ক্লাবটি। ডোভার স্ট্রীটে ছিল এর অফিস। লণ্ডনের তখনকার নামকরা বৈজ্ঞানিক ও লেখকরাও এই ক্লাবের বিভিন্ন বৈঠকে সমবেত হতেন। আসতেন বিশ্ব-বিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ, আসতেন মনীষী টমাস হাক্সলি এবং আরো অনেকেই যাঁদের বহুবিধ চিন্তার দানে আজকের মানুষের চিন্তার ভাণ্ডার হয়েছে সমৃদ্ধ। এইভাবেই সেদিন বিদুষী মার্গারেট লণ্ডনের শিক্ষিত সমাজে তাঁর আসন করে নিয়েছিলেন। এই ক্লাবেরই একদিনের বৈঠকে মার্গারেটের সঙ্গে দেখা হোল আর একজন অভিজাত শিক্ষিতা মহিলার। নাম—লেডি ইসাবেল মার্গসন।

দিন যায়। লণ্ডনের বিদগ্ধ সমাজে বৃদ্ধি পায় মার্গারেটের প্রতিষ্ঠা। অজস্র কাজের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয় তাঁর দিনগুলি। নিজের স্কুল পরিচালনা, কাগজে প্রবন্ধ লেখা, সভা-সমিতিতে যোগদান করা আর এ ছাড়া, লণ্ডনে থেকে স্বদেশের রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা, এইসব নানা রকমের কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন তিনি। এইভাবেই যখন অতিবাহিত হচ্ছিল তাঁর দিনগুলি, তখন একদিন নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই মার্গারেটের জীবনপথে উদিত হলেন তাঁরই জীবন-দেবতা—স্বামী বিবেকানন্দ।
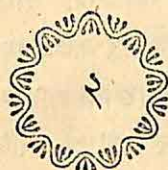
১৮৯৫ সালের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে এলেন।

এলেন তিনি য়ুরোপীয় সভ্যতার পীঠস্থান লণ্ডনে।

বছর দুই আগেও যিনি ছিলেন নিতান্ত অখ্যাত, অজ্ঞাত, সেই স্বামী বিবেকানন্দ আজ পাশ্চাত্য মহাদেশ আমেরিকার চিত্তলোক জয় করে এসেছেন য়ুরোপের প্রাণকেন্দ্র লণ্ডন শহরে। আজ অতলান্তিক মহাসাগর অতিক্রম করে এই তরুণ সন্ন্যাসীর খ্যাতির বার্তা এসে পৌঁছেছে এইখানে। আমেরিকায় তিনি গিয়েছিলেন বেদান্তের মহিমা প্রচার করতে। সনাতন হিন্দুধর্ম আর ভারতীয় সভ্যতার বাণী বহন করে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন সেই দেশে।

১৮৯৩ সালে চিকাগো শহরে এক মহাধর্মসম্মেলন হয়। ভারতবর্ষ থেকে ছয়জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। তিনি হিন্দুধর্মের পক্ষ থেকে যোগদান করেন। পৃথিবীর আরো অনেক দেশ থেকেই অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিরাও যোগদান করেছিলেন। এই ধরনের সম্মেলন এর আগে পৃথিবীতে আর কখনো হয়নি। আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের সেই বিজয়-অভিযানের ইতিহাস এখানে একটু বলা দরকার।

১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো শহরে

একটা মেলা বসেছিল। সেই মেলার নাম—বিশ্বমেলা বা ওয়ার্লডস ফেয়ার। ধর্মসম্মেলনটি ছিল এই মেলারই একটা অঙ্গ। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যে ঐহিক উন্নতি লাভ করেছে, এই মেলায় সর্বপ্রথম তা প্রদর্শিত হবার ব্যবস্থা হয়। সেই সঙ্গে মেলার উদ্যোক্তারা ভাবলেন যে, সভ্য মানুষ চিন্তার জগতে কতখানি এগিয়ে গেছে, তারো একটা প্রদর্শনী করতে পারলে মন্দ হয় না। এই উদ্দেশ্য নিয়েই একটি বিশ্বধর্ম-সম্মেলনের (পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়নস) ব্যবস্থা হয়। শুনলে আশ্চর্য হোতে হয়, এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা যিনি করেছিলেন তিনি কোনো গির্জার পাদ্রী ছিলেন না, একজন আইনব্যবসায়ী ছিলেন মাত্র। নাম তাঁর ডাঃ বনি। আর এই বিরাট পরিকল্পনাটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল যাঁর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে তিনি হলেন চিকাগোর একটি গির্জার প্রধান ধর্মযাজক রেভারেণ্ড ডাঃ জন ব্যারোজ। তিনিই ছিলেন সম্মেলনের সাধারণ কমিটির চেয়ারম্যান। ব্যারোজ সাহেব পরে এই দেশে এসে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। এই মেলা ও ধর্মসম্মেলনের উদ্যোগ-আয়োজন করতে সময় লেগেছিল আড়াই বছর। বিস্ময়ের কথা এই যে, চিকাগোর এই বিশ্বমেলায় ধর্মসম্মেলনটা দর্শকদের কাছে হোয়ে উঠেছিল সবচেয়ে আকর্ষণের বিষয়। তার একটা কারণ ছিল। পৃথিবীর দূর-দূরান্ত দেশ থেকে সর্বসমেত ছয় হাজার প্রতিনিধি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই সম্মেলনে সেদিন আমন্ত্রিত হোয়ে যোগদান করেছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি পৃথিবীর প্রচলিত বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের একসঙ্গে দেখার জন্য সম্মেলনের হলটি সেদিন সহস্র সহস্র দর্শক সমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সত্যের অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে একটা পারস্পরিক শুভ ইচ্ছা জাগিয়ে তোলাই ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্যের সূত্র খুঁজে বের করা আর সেই ঐক্যের পথ ধরে আগামী দিনের মানুষ

ঈশ্বর-প্রেম ও মানব-সেবার ভিতর দিয়ে তাদের জীবনের চরিতার্থতার পথ খুঁজে পাবে—এইটাই ছিল সম্মেলনের সুমহৎ লক্ষ্য।

ধর্মসম্মেলন আরম্ভ হবার মাত্র দু'দিন আগে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো শহরে এসে উপস্থিত হোলেন। তিনি নিমন্ত্রিত প্রতিনিধি ছিলেন না, কারণ তখন কি এদেশে, কি ওদেশে কেই-বা তাঁর নাম জানতো। আমেরিকায় তিনি এসে পৌঁছেছিলেন ১৮৯৩ সালের জুলাই মাসের শেষে। তখনো সম্মেলনের দু'মাস দেরী। একজন সহৃদয়া মার্কিন মহিলার আতিথ্য তিনি গ্রহণ করেন। মহিলার বাড়ি ছিল বোস্টন শহরে। সেই দু'মাসকাল তিনি তাঁরই বাড়িতে বাস করেন। তারপর সম্মেলন আরম্ভ হবার দু'দিন আগে চিকাগোতে আসেন। এইখানে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় মিঃ জর্জ ডবলিউ হেল নামে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে। স্বামী বিবেকানন্দ যাতে ধর্মসম্মেলনের একজন প্রতিনিধি বলে গৃহীত হন তার সকল ব্যবস্থা তিনিই করে দিয়েছিলেন।

১১ই সেপ্টেম্বর। সকালবেলা।

চিকাগোর বিশাল আর্ট ইনস্টিট্যুট ভবনের প্রশস্ত হলটিতে বিশ্বধর্ম সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হোল। বেলা দশটা। প্রায় চার হাজার দর্শক সমবেত হয়েছেন। প্রতিনিধিরা বসে আছেন মঞ্চের উপর। তাঁদের বিচিত্র সজ্জা আর বেশ-ভূষা দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। মঞ্চের মাঝখানের চেয়ারে বসেছেন খ্রীষ্টান জগতের প্রধান কার্ডিনাল গিবনস ; তাঁর ডানদিকে দশজন চীনা বৌদ্ধ পুরোহিত আর বাঁ দিকে বসেছেন গ্রীসের কয়েকজন ধর্মযাজক ; তাঁদের পোষাক কালো রঙের। জাপানী বৌদ্ধ প্রতিনিধিদের পরিচ্ছদ ছিল শ্বেত ও হরিদ্রা বর্ণের—বড়ো সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁদের। সিংহলের বৌদ্ধ প্রতিনিধি, আচার্য ধর্মপালের পোষাকটি ছিল আগাগোড়া শাদা—তাঁর

কালো কোঁকড়ানো চুল কাঁধের উপর নেমে এসেছে। আর একদিকে পাশাপাশি বসেছেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি, বৃদ্ধ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আর থিয়োজফি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী। সেই জাঁকজমকপূর্ণ বিচিত্র বর্ণের পোষাকে সজ্জিত প্রতিনিধিবর্গের একপাশে বসে আছেন হিন্দুধর্মের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় মানুষটি —স্বামী বিবেকানন্দ।

পৃথিবীর দেশ-বিদেশ থেকে সমাগত বিখ্যাত পুরোহিত এবং পণ্ডিতজনের সেই সভায় বিবেকানন্দই ছিলেন বয়োকনিষ্ঠ।

পরিচয়হীন ভিক্ষুক-সন্ন্যাসী।

তরুণ বয়স। মুখে-চোখে উজ্জ্বল দীপ্তি, পরিধানে আজানুলম্বিত গৈরিক আলখাল্লা, মাথায় গৈরিক পাগড়ি। চমৎকার বেশ—দর্শকবৃন্দ সবিস্ময়ে যেন তাঁরই দিকে চেয়ে আছেন। সম্মেলনের বৈকালিক অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দের ডাক পড়ল। তৈরি-করা কোনো বক্তৃতা তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যাননি। কী বলবেন, ভেবে পেলেন না প্রথমে। তখন মনে মনে তিনি স্মরণ করলেন তাঁর ইষ্টদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে। ঠাকুরের নির্দেশেই তো তিনি এসেছেন এখানে। তিনি তো যন্ত্র মাত্র, যন্ত্রী তো দক্ষিণেশ্বরের ঈশ্বর—সেই অর্ধ-শিক্ষিত, মাতৃনামে বিভোর পুরোহিত ব্রাহ্মণ যিনি বলেছিলেন—"নরেনকে দিয়ে পৃথিবীতে অনেক বড়ো কাজ হবে।" নরেন অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ দত্ত বিবেকানন্দেরই আগের নাম। তবে আর উদ্বেগ কোথায়? তাঁরই কাছে পাওয়া জ্ঞানৈশ্বর্যের পুঁজি নিয়ে তিনি এসেছেন আমেরিকায়। তবে আর ভয় কী? মুহূর্তমধ্যে দ্বিধা কেটে যায়। মঞ্চের সম্মুখে বিজয়ী বীরের ভঙ্গিতে তখন উঠে দাঁড়ালেন স্বামী বিবেকানন্দ।

সেই তরুণ সন্ন্যাসী মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়িয়ে সেই বিরাট জনসমাবেশকে সম্বোধন করলেন: "আমেরিকাবাসী আমার প্রিয় ভ্রাতা ও

ভগ্নীবৃন্দ।" এই সহৃদয় সম্বোধনের ফলে সকলের মনের মধ্যে চকিতে যেন বিদ্যুতের একটা শিহরন খেলে গেল। তাঁর আগে তো কতজন উঠে বক্তৃতা দিলেন, কিন্তু তাঁদের কেউই তো আমেরিকাবাসীদের এমন পরম আত্মীয়তার সুরে সম্বোধন করেন নি। উঠলো ঘন ঘন করতালি আর সাধুবাদ। তারপর চললো তাঁর বক্তৃতা—উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রাণের আবেগ ঢেলে দিলেন তিনি বক্তৃতার মধ্যে। আবেগের সঙ্গে ছিল জ্ঞানগর্ভ বাণীর বিদ্যুৎস্ফুরণ। স্বামীজি তাঁর উদাত্তকণ্ঠে যখন বললেন, "যে ধর্ম সমস্ত পৃথিবীকে পরের মত সহ্য করতে আর সকল মতের সর্বজনীনতাকে গ্রহণ করতে শিক্ষা দিয়েছে; আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে গৌরব বোধ করে থাকি—আমরা সকল ধর্মই সত্য বলে বিশ্বাস করি"—তখন সকলের মন শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে পূর্ণ হয়ে উঠল।

চিকাগো ধর্মসম্মেলনের বক্তৃতামঞ্চে অন্যান্য প্রতিনিধিরা শুনিয়েছিলেন তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার কথা আর তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মতবাদের প্রাধান্যের কথা। কিন্তু একমাত্র বিবেকানন্দই সেদিন শুনিয়েছিলেন তাঁর কথা যিনি সর্ব-মানবের ভগবান। সেইজন্যেই তো সেদিন সারা আমেরিকার দিক-বিদিক মুখরিত হয়েছিল এই হিন্দু-সন্ন্যাসীর জয়গানে। ধর্মসম্মেলনে এমন করে আর কেউ বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের প্রাণের কথা বলতে পারেন নি। তারপরও তিনি যতদিন আমেরিকায় ছিলেন, অনেক বক্তৃতা করেছিলেন অনেক শহরে। বিশ্বধর্মসভার অধিবেশন শেষ হবার পর থেকে, স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার নগরে নগরে ঝড়ের বেগে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন প্রায় দু'বছর ধরে। এজন্য তাঁকে ভীষণ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। বক্তৃতা দেওয়া, ছাত্রদের নিয়ে আলোচনা বৈঠক—এমনি করে তিনি সেখানে এক নতুন জীবনচেতনার সৃষ্টি করেছিলেন।

ওদেশে তিনি শুধু বেদান্তের বাণীই প্রচার করেন নি।

আরো অনেক বেশি কাজ করেছিলেন ; ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মহিমাকে সেখানে তিনি এক নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর আগে এই কাজ আর কেউ করতে পারেন নি। তাঁর মহত্ব এইখানেই। কলম্বাস শুধু আমেরিকার ভৌগোলিক সত্তা আবিষ্কার করেছিলেন, আর উনিশ শতকের শেষভাগে এক তরুণ হিন্দু-সন্ন্যাসী আবিষ্কার করলেন আমেরিকার আত্মা। তার মধ্যে সঞ্চার করে দিলেন নবজীবনের বিদ্যুৎপ্রবাহ। তাঁর অনন্যসাধারণ মানবিকতার মধ্যে আমেরিকার লোকেরা পেয়েছিল এক পরমাত্মীয়ের অন্তরঙ্গ স্পর্শ। সেখানকার অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত নর-নারী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বিবেকানন্দ শুধু দিয়ে আসেন নি, কিছু নিয়েও এসেছিলেন। বেদান্ত প্রচারের বিনিময়ে তিনি আমেরিকার কাছ থেকে পেয়েছিলেন সেবাধর্মের এক নতুন আদর্শ। ওদেশের সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁকে আকর্ষণ করেছিল বিশেষভাবে। তারপর ১৮৯৫ সালের অগস্ট মাসের মাঝামাঝি তিনি আমেরিকা থেকে এলেন ইংলণ্ডে।

স্বামী বিবেকানন্দ এসেছেন লণ্ডনে।

কুয়াশায় ভরা এক শীতের সকালে মার্গারেট সন্ধান পেলেন অপ্রত্যাশিত সূর্যালোকের। সেদিনের প্রভাতী সংবাদপত্রে পাঠ করলেন, এক হিন্দুযোগী এসেছেন লণ্ডনে। তাঁর বক্তৃতা শুনে সবাই মুগ্ধ হয়েছে। সংবাদে তিনি আরো পড়লেন, এই হিন্দুযোগীর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। সমস্ত বড়ো বড়ো কাগজে তাঁর বক্তৃতার প্রশংসা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মার্গারেট পড়লেন সেইসব খবর। মনের মধ্যে উঠল এক নতুন ভাবের তরঙ্গ, কি এক আকর্ষণ বোধ করলেন তিনি এই সন্ন্যাসীর প্রতি। কুমারীর হৃদয়ের পটে চিরদিনের মতো অঙ্কিত হোয়ে গেলো একটি নাম—'স্বামী বিবেকানন্দ। কী এক অজানা আহ্বানের প্রতীক্ষায় মার্গারেটের সত্তা হোয়ে উঠল যেন উদ্‌গ্রীব।

চঞ্চল। ঠিক এমনি সময়ে একদিন তাঁর এক বান্ধবী এসে খবর দিলেন যে, মিঃ স্টার্ডির বাড়িতে এই নবাগত হিন্দু সন্ন্যাসী বাস করছেন। আজ পিকাডেলির প্রিন্সেস হলে তিনি আর একটা বক্তৃতা করবেন।

শীতের ম্লান অপরাহ্ণ। অক্টোবরের শেষ। প্রিন্সেস হলে অনেক শ্রোতার সমাবেশ হয়েছে আজ। কিছুটা আগ্রহ আর কিছু কৌতূহল নিয়ে মার্গারেট এসেছেন তাঁর এক বান্ধবীর সঙ্গে হিন্দুযোগীকে দেখতে আর তাঁর মুখের কথা শুনতে। বক্তৃতা আরম্ভ হবার ঠিক দু'মিনিট আগে সভায় এসে উপস্থিত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

এই সেই হিন্দুযোগী! ভাবেন মার্গারেট ভীড়ের একটি কোণে দাঁড়িয়ে। কী মহিমামণ্ডিত সৌম্য আকৃতি। দীর্ঘ ও আয়ত চোখ দুটি কী সুন্দর—সেই চোখের দৃষ্টিতে যেন ঝরছে স্বর্গের আনন্দ। তাঁর সমস্ত মুখখানি ভরে আছে, তপস্যা, পবিত্রতা, আর সংযমের একটা দিব্য জ্যোতি। সুগঠিত দেহ গৈরিকবাসের আবরণে ঢাকা, মাথায় গেরুয়া রঙের একটি উষ্ণীশ। গৈরিকবাসমণ্ডিত সেই প্রশান্ত মূর্তি যেন অভ্রভেদী হিমালয়ের একটি উত্তুঙ্গ শিখর।

বক্তৃতা আরম্ভ হোল। সভার কলাগুঞ্জন অমনি নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। মধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর—যেন সেন্ট পীটার্স গির্জার ঘণ্টার আওয়াজ। এমন উদাত্ত কণ্ঠস্বর মার্গারেট এর আগে আর কখনো শোনেন নি—শোনেন নি এমন চিত্তস্পন্দী ভাষণ। মেঘের মতো গুরু-গম্ভীর সেই কণ্ঠস্বরে গম্ গম্ করে উঠল হলের ভেতরটা। সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ আবিষ্ট হয়ে সবাই শুনছে আর ভাবছে, ধর্মের মতো নীরস বিষয় কী সুন্দর করেই না বলা যায়। যুক্তি, মনীষা, জ্ঞান আর পাণ্ডিত্যের ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে সন্ন্যাসীর কণ্ঠোচ্চারিত প্রতিটি বাক্যে। শ্রোতার কানের ভেতর দিয়ে একেবারে তার মর্মে গিয়ে পৌঁছায় যেন—নিয়ে যায় তাকে এক অজানিত শান্তির দেশে।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

সকল জিনিসের মধ্যেই আছেন সেই এক ভগবান।

যখনই এই পৃথিবীতে দেখা দেয় ধর্মের গ্লানি, অধর্ম ওঠে মাথা চাড়া দিয়ে, তখনই আমি আসি ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করতে আর দুষ্কৃতকারীদের দমন করতে আর পরিত্রাণ করতে সাধুদের। সম্ভবামি যুগে যুগে।

সন্ন্যাসী একটু চুপ করে আবার বলেন ঃ শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা—শোনো অমৃতের পুত্রগণ, তমসার পরপারে অবস্থিত আদিত্য-প্রতিম সেই মহান পুরুষকে আমি জেনেছি—একমাত্র তাঁকে জানতে পারলেই অমরত্বলাভ করা যায়। এই একমাত্র পথ।

এইভাবে চলে বক্তৃতার স্রোত। বক্তৃতা নয়—যেন জলপ্রপাত। যেমন তার শক্তি, তেমনি তার মাধুর্য। কথার ফাঁকে ফাঁকে দু-একটি সংস্কৃত শ্লোক। ব্যাখ্যা করেন নিজেই। শ্রোতারা শুনছেন উৎকর্ণ হয়ে—রোমাঞ্চ জাগে তাঁদের দেহে ও মনে। রোমাঞ্চ জাগল মার্গারেটের মনেও। এক বিচিত্রভাবে উদ্বেলিত হোয়ে ওঠে তাঁর সমস্ত সত্তা। সেদিন ঐ পর্যন্ত।

পরের দিন। আজ বিকেলে লেডি ইসাবেল মার্গসনের ভবনে হিন্দুযোগী এক ঘরোয়া বৈঠকে কিছু আলোচনা করবেন। ইসাবেল মার্গারেটকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন আসবার জন্য। মনের মধ্যে অসীম কৌতূহল আর আগ্রহ নিয়ে মার্গারেট এলেন। ইতিমধ্যেই কিছু লোক এসে গিয়েছিল। তিনি এসে সামনের একটি খালি চেয়ারে বসে পড়লেন নীল রেশমের গাউনটি সন্তর্পণে গুটিয়ে নিয়ে। পঁচিশ-ত্রিশজন লোক ঘরের মধ্যে। সবাই শান্তভাবে বসে আছেন। ধূপের চড়া সুগন্ধ ঘরের ভিতরকার বাতাসে মিশছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী হোয়ে। মার্গারেট প্রায় বিবেকানন্দের মুখোমুখি বসেছিলেন। লক্ষ্য করলেন, প্রসন্ন গাম্ভীর্যের একটা স্নিগ্ধ হিল্লোল সন্ন্যাসীকে ঘিরে রয়েছে যেন। কী প্রশান্ত, আত্মসমাহিত পুরুষ, চারপাশে কি চলছে সেদিকে যেন ভ্রূক্ষেপই নেই।

গৃহকর্ত্রী লেডি ইসাবেল বললেন—স্বামীজী, আমাদের বন্ধুরা সবাই এসেছেন।

সহাস্য বদনে সন্ন্যাসী চারদিক তাকিয়ে দেখেন। ঘরের দরজাটা টেনে দেওয়া হোল। পর্দাটা নামিয়ে দেওয়া হোল। সবাই নিস্তব্ধ। শোনা গেল সন্ন্যাসীর কণ্ঠে প্রার্থনার মন্ত্র—শিবোঽহম্ শিবোঽহম্—নমঃ শিবায়। তারপর আরম্ভ হয় বক্তৃতা। অনেকক্ষণ ধরে বললেন তিনি। বলার ভঙ্গিটি শান্ত—গলার স্বর পর্দায় পর্দায় ওঠে নামে। মাঝে মাঝে এক-আধটা সংস্কৃত শ্লোক বলে অনুবাদ করেন চমৎকার ইংরেজিতে। বিশুদ্ধ বাগ্‌ভঙ্গী। আলোর মন্ত্রের সঙ্গে এদের পরিচয় করাতে যেন অসীম আনন্দ তাঁর। কেউ যদি কোনো প্রশ্ন করে, উত্তর দেন সহজ ভাষায়। মুগ্ধ মনে মার্গারেট শুনছেন আর ভাবছেন—কোথায় গেল তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর বিচারবুদ্ধি। তর্ক করবেন বলে মনে মনে সংকল্প করেছিলেন আজ। সেইভাব তো আর নেই এখন। সব-কিছুকে পরাস্ত করে একটা পরিপূর্ণ শূন্যতা আচ্ছন্ন করে তাঁর মনকে। এ কোন্ অলৌকিক অভিনব শক্তি অভিভূত করলো তাঁর সেই স্বাধীন সত্তাকে?

"মানুষ কি চায়? সুখ নয়, দুঃখ নয়, মুক্তি—শুধু মুক্তি চায়। আমাদের সমস্ত তপস্যা শুধু অবন্ধন মুক্তির তপস্যা।"

এই বলে সন্ন্যাসী তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। চমৎকার কথা। নিপুণ ছন্দে গাঁথা বাণীর একখানি মালা যেন। আর তাঁর মুখের উচ্চারিত কথাগুলির কী শক্তি। শ্রোতারা সবাই যেন নিজেদের নতুন চোখে দেখতে পেলেন। নতুন চোখে নিজেকে দেখলেন মার্গারেটও। একটা গভীর নিবিড় শান্তিতে ভরে উঠল তাঁর কুমারী-মন। হিন্দু-যোগীকে তিনি তাঁর আচার্য—গুরু বলে স্বীকার করবেন ঠিক করলেন।
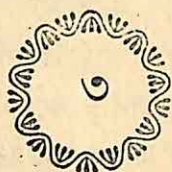
কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলাপ হবার অনেক আগেই লণ্ডনে আরেকজন বিশিষ্ট ভারতীয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন মার্গারেট। তিনি বাংলার গৌরব রমেশচন্দ্র দত্ত। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত সিবিলিয়ান এবং বিবেকানন্দের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো। জিলা শাসকের কাজ করলেও, দেশের বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে তিনি আলোচনা করতেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনিই প্রথম বাংলায় ঋগ্বেদের অনুবাদ করেন। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে এদেশে তিনিই প্রথম আলোচনা করেন এবং এই বিষয়ে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থও রচনা করেন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন কি এদেশে, কি ইংলণ্ডের শিক্ষিত সমাজে, রমেশচন্দ্র দত্তের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। ছাত্রজীবন থেকে আরম্ভ করে পরিণত বয়স পর্যন্ত তিনি অনেকবার বিলেত গিয়েছিলেন। মার্গারেট যখন রমেশচন্দ্রের লেখা পড়েন—বিশেষ করে তাঁর ইংরেজিতে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ আর প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থ—তখন থেকেই তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং রমেশচন্দ্র শেষ জীবনে যখন কিছুকালের জন্য অবসর নিয়ে লণ্ডনে এসে বাস করেন সেই

সময়ে মার্গারেট একদিন নিজে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। প্রথম আলাপেই রমেশচন্দ্র এই বিদুষী বিদেশিনী মহিলার ভারতবর্ষের প্রতি অনুরাগ দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। মার্গারেট রমেশচন্দ্রকে 'ধর্মপিতা' বলে স্বীকার করেন এবং তিনিও তাঁকে কন্যার মতন স্নেহ করতেন। তারপর মার্গারেট যখন বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ভারতবর্ষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করলেন, তখন থেকে রমেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পূর্ব-পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল। তাঁর গুরু, স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত এই মনীষী রমেশচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

দিন যায়। আরো কয়েকটা বক্তৃতা শুনে মার্গারেটের মনে এই ধারণা দৃঢ় হোল যে, এই হিন্দুসন্ন্যাসী একটি জীবন্ত মানুষ—তাঁর জীবনের দুইতট দিয়ে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে অসীম প্রাণ-প্রবাহ—আধ্যাত্মিকতার একটা বিরাট তরঙ্গ। মনে হোল—ইনি তো লণ্ডনের মুক্তি-ফৌজদের মতন ভাড়াটিয়া বক্তা নন। তিনি কোনো নতুন সম্প্রদায়ও প্রতিষ্ঠা করতে আসেন নি। তাঁর ইষ্টদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে যে শিক্ষা তিনি লাভ করেছেন, তা কোনো পুঁথির প্রাণহীন শিক্ষা নয়—তা প্রত্যক্ষ অনুভূতিলব্ধ সত্য। জগতে সেই সত্য প্রচার করাই তাঁর জীবনের ব্রত। বুঝলেন, সন্ন্যাসী বিশেষ কোনো ধর্মমতেরও প্রচারক নন। তাঁর বিশ্বাস, বেদান্তের উদার জ্ঞানসমষ্টি সকল ধর্মের মানুষই নিজের নিজের ধর্ম বজায় রেখে গ্রহণ করতে পারে।

এই গভীর আশা ও আশ্বাস-ভরা বাণীর প্রতীক্ষায় কত রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন মার্গারেট। মুগ্ধ বিস্মিত এক শিক্ষিতা কুমারী আজ সন্দেহ-আন্দোলিত জীবন-সমুদ্রে পাড়ি জমাবার এক দরদী কাণ্ডারীর সন্ধান পেলেন বুঝি। সেই থেকে প্রতি রবিবার যেখানে এই সন্ন্যাসী ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হোতেন, মার্গারেট সেখানে উপস্থিত হয়ে মন

দিয়ে শুনতেন তাঁর কথা। অ-খৃষ্টান এক ভারতীয় সাধু, তিনি তো মানুষে মানুষে ভেদের কথা বলেন না, বলেন না অন্য ধর্মের দোষগুণ বা ভালো-মন্দের কথা, শুধু অন্তরে অনুভব করেন নিখিলের চিরন্তন অভীপ্সা—শান্তি আর ক্ষান্তি। নিজের বুক-ভরা ভালোবাসার ঢেউ তোলেন কণার বুকে—বিন্দুর মধ্যে দেখা দেয় উতরোল ভাবের সিন্ধু। এ এক আশ্চর্য সন্ন্যাসী, ভাবেন বিদুষী মার্গারেট। প্রেম আর শক্তির এমন মহিমান্বিত মূর্তি বুঝি এই পৃথিবীতে দুর্লভ।

এ শুধু মার্গারেটের মনের কথা ছিল না। আরো অনেকেরই মনে এইরকম ভাবের উদয় হোয়েছিল সেদিন। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনবার জন্যে সারা লণ্ডন শহর উদ্‌গ্রীব হোয়ে উঠলো যেন। কত শিক্ষিত শ্রোতার সমাবেশ হয় তাঁর সভায়। সবাই তাঁকে দেবতার মতো পূজো করলো—সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় হিন্দুযোগীর সকল বক্তৃতার বিস্তারিত বিবরণ। তাঁকে নিয়ে টানাটানি, সবাই তাঁকে পেতে চায়, শুনতে চায় তাঁর মুখের অমৃতবাণী। আমেরিকাবাসীর চিত্ত যেমন তিনি জয় করেছিলেন একদিন, আজ লণ্ডনেও তেমনি বিজয়ী হোলেন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। ধর্মের ইতিহাসে এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটেনি।

আর একদিনের কথা।

লণ্ডনের আর একটা জায়গায় বক্তৃতা করলেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। সেদিন সেখানে গুণী ও জ্ঞানীর সমাবেশ হয়েছিল বেশি। মার্গারেটও উপস্থিত। না এসে পারেননি ; কারণ তাঁর সকল চিন্তা এখন আচ্ছন্ন করেছে এই সন্ন্যাসীর চিন্তাধারা। বিবেকানন্দ তাঁর শ্রোতাদের প্রথম সম্ভাষণ করলেন এক তীক্ষ্ণ প্রশ্নের খোঁচা দিয়ে বললেন : "তোমাদের কল-কারখানা, ছাপাখানার ফলে যা না হোয়েছে, একজন যীশুখৃষ্ট বা একজন বুদ্ধদেবের কয়েকটা কথায় মানব-সমাজের ঢের বেশি উপকার হয় নি কি ?"

একদিন ঘরোয়া বৈঠকে সোজাসুজি মার্গারেট বললেন তাঁকে ঃ "আপনার সব কথা যে বুঝতে পারি, বা সব কথা সত্য বলে মেনে নিতে পারি, আমার প্রকৃতি সে রকম নয়।"

—বিচার না করে আমি কোনো কথাই কাউকে গ্রহণ করতে বলি না। উত্তর দিলেন বিবেকানন্দ। আরো বললেন ঃ "এই রকম সংশয় ভালো। যাচাই করে, পরীক্ষা করেই তো সত্যকে গ্রহণ করতে হয়। তবেই তো সত্য সত্য হোয়ে ওঠে আর জীবনে তা স্থায়ী হয়।

এর চেয়ে বড়ো কথা আর নেই, ভাবেন মার্গারেট মনে মনে। তবু তাঁর তার্কিক মন মানে না। আবার প্রশ্ন তোলেন ঃ ধর্মরাজ্যের সব কথা আপনি জানেন ?"

—হ্যাঁ। রাস্তার কোথায় কি আছে তা তন্ন তন্ন করে জানি। এবং এতটুকুও গুরুর প্রসাদে আমার অজ্ঞাত নেই।

এ কি শুধু কথার কথা ? তা তো মনে হয় না, ভাবেন মার্গারেট। বলবার ভঙ্গিতে প্রত্যয় যেন উদ্ভাসিত। এঁর অন্তর-বাহির একটা নতুন জীবনদর্শনের দিব্য বিভায় যেন উদ্দীপ্ত, সচকিত। য়ুরোপীয় দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে এ জিনিস তো তিনি খুঁজে পান নি কখনো।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।

এমন সুন্দর কথা তো তিনি এর আগে শোনেন নি। যা অনন্ত অসীম তাই-ই অমৃত, শাশ্বত আর চিরকালের মত আনন্দদায়ক।

য়ুরোপীয় দর্শন তো এমন কথা বলতে পারে নি।

দেখতে দেখতে এক নতুন জীবনদর্শন—যার ভিত্তি ছিল অদ্বৈত বেদান্ত, উদ্ভাসিত হোয়ে উঠলো মার্গারেটের চেতনায়। এ যেন এক কুমারী-মনের উদয় শিখরে এক নতুন প্রভাত। তাঁর সমস্ত দেহ-মন সাড়া দিয়ে উঠল। বেদান্ত নিয়ে এলো সেই বিদুষী আইরিশ কুমারীর

চিন্তাজগতে এক তুমুল পরিবর্তন। ক্রমে তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠলো এক বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা—বেদান্তের উদার আদর্শের বেদীমূলেই তিনি করবেন আত্মনিবেদন। তিনি হবেন 'জীবন্ত বেদান্তী'।

পরবর্তীকালে স্বামীজীর মৃত্যুর পর নিবেদিতা একখানা বই লিখেছিলেন—*The Master as I saw Him*—'মদীয় আচার্যদেব'। বইখানা তাঁরই জীবনস্মৃতি। লণ্ডনে বিবেকানন্দকে প্রথম দেখবার পর বিগত দিনের স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "স্বামীজী যেন আমাদের কাছে কোন্ এক দূর দেশের বার্তা বহন করে এনেছেন। তাঁর কণ্ঠের সেই সুমধুর সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি ভুলবার নয়। তিনি কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনটিকে আত্মার তিনটি পথ বলে উল্লেখ করেন। তিনি আমাদের বলেন যে, সকল ধর্মের একমাত্র শিক্ষা এই ঃ ত্যাগ কর, ত্যাগ কর। তিনি আরো বলেন যে, মানুষ ভুল থেকে ভুলে এগিয়ে চলে না সত্য থেকে সত্যেই এগিয়ে যায়। হিন্দুযোগীর সম্বন্ধে আমার প্রথমে একটু গর্ব ও উদাসীনতার ভাব ছিল। কিন্তু পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর প্রত্যেকটি মতের প্রতিধ্বনি বা তারই মতো আর একটি মত এর আগে শুনে বা ভেবে থাকতে পারি, কিন্তু এর আগে আমার ভাগ্যে এমন কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তির দর্শনলাভ ঘটেনি, যিনি সামান্য একঘণ্টা সময়ের মধ্যে, আমি এ পর্যন্ত যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্টতর বলে জানতাম, সেই সবই প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।"

প্রথমবার বিবেকানন্দ লণ্ডনে বেশি দিন ছিলেন না। আবার আমেরিকায় ফিরে গিয়েছিলেন। চারমাস পরে তিনি আবার এলেন লণ্ডনে। ১৮৯৬ সালের মে মাস থেকে আরম্ভ হয় তাঁর বক্তৃতা। আচার্যদেব লণ্ডনে এসেছেন শুনে মার্গারেট গেলেন একদিন তাঁর

সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এবার স্বামীজী স্মিতহাস্যে তাঁকে জানালেন সম্ভাষণ। বিদ্যুৎপুঞ্জ সমপ্রভ সেই মূর্তি আজ তাঁর অন্তরের অন্তরলোকে স্থাপিত হয়েছে। তাঁর দেবদুর্লভ চরিত্র কুমারীর হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে এক নতুন ধর্মভাবের, এক দিব্য প্রেরণার।

ক্লাব, সোসাইটি, গ্যালারি, হল—যখন যেখানে বিবেকানন্দের বক্তৃতা হয়, শত কাজ ফেলে মার্গারেট সেখানে উপস্থিত থাকেন। তাঁর বিখ্যাত 'রাজযোগ,' 'জ্ঞানযোগ', সম্পর্কিত বক্তৃতাগুলি এই সময়েই লণ্ডনের বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত হয়। শুধু কি বক্তৃতা শুনতেন, অবসর পেলেই মার্গারেট আসতেন স্বামীজীর কাছে, দু'দণ্ড বসতেন তাঁর কাছে, বলতেন কত কথা, তুলতেন কত প্রশ্ন। বিবেকানন্দ বুঝলেন—এই বিদুষী আইরিশ কুমারী যেন একটি হোমাগ্নি শিখা।

একদিন। পিকাডেলির আর্ট গ্যালারিতে বিবেকানন্দ বক্তৃতা করলেন। তেমনই লোকসমাগম। বক্তৃতার শেষে একজন পক্ককেশ দার্শনিক তাঁর সন্মুখে এসে আচমকা বললেন—আপনি যা বললেন তারমধ্যে নতুন কিছু নেই।

অদ্ভুত কথা। শুনে সবাই বিস্মিত।

—বন্ধু, আমি যা বলেছি তা আর কিছুই নয়—সত্য। এই সত্য হিমালয়ের মতো প্রাচীন, মনুষ্যজাতির মতো প্রাচীন সৃষ্টির ন্যায় প্রাচীন এবং স্বয়ং ভগবানের ন্যায় প্রাচীন।

অদ্ভুত উত্তর। শুনে চমকিত হয় সবাই। চারদিক থেকে উচ্চকণ্ঠে উঠলো সাধুবাদ আর শোনা গেল করতালি ধ্বনি।

দিন যায়। মার্গারেটের সমস্ত হৃদয় যেন লুটিয়ে পড়তে চায় তাঁর জীবন-দেবতার চরণে। কিন্তু সব সংশয় তো এখনো সম্পূর্ণ কাটেনি। এখনো তো সন্ন্যাসীর অন্তরের আসল রূপটি তাঁর উপলব্ধির গোচর হয়নি। একদিন লণ্ডনের এক অভিজাত মহিলার

গৃহে একটি বৈঠক বসল। মার্গারেট উপস্থিত হোলেন সেখানে। বক্তৃতার শেষে আরম্ভ হয় আলোচনা। কথায় কথায় উঠলো ভারতের কথা। স্বামীজী শোনান ভারতের প্রাচীন তীর্থ আর বিখ্যাত শহরগুলির কথা। নিঃসংকোচে বলেন স্বদেশের উন্নতি-অবনতির ইতিহাস।

—কিন্তু লণ্ডনের মতো শহর পৃথিবীর মধ্যে আর দ্বিতীয় নেই—শিক্ষা আর শিল্প-সম্পদের পীঠস্থান এই লণ্ডন, বললেন মার্গারেট।

—সত্যি কথা, খুব সত্যি কথা। অতুলনীয় শহর তোমাদের এই লণ্ডন, এইটুকু বলে চুপ করলেন বিবেকানন্দ। তারপর তিনি দিলেন একটা অপ্রত্যাশিত আঘাত; বললেন, "কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাটা ভুলে যাও কেন যে, এই লণ্ডনের সৌন্দর্যের পিছনে রয়েছে দেশ-বিদেশের কত লুণ্ঠিত সম্পদ। কোম্পানির শাসনের আমলে ইংলণ্ড দশ হাতে লুঠ করেছে ভারতের অজস্র ধন-সম্পদ আর তাই দিয়ে গড়ে উঠেছে ইংলণ্ডের যত কল-কারখানা আর শিল্প, এ আমার কথা নয়, ইতিহাসের সত্য।

সকলেই বিস্মিত হয় সন্ন্যাসীর এই স্পষ্ট কথায়।

মার্গারেট আরো বিস্মিত। সন্ন্যাসী সম্পর্কে যেটুকু সংশয় ছিল তা আজ দূর হোল।

তারপর য়্যানি বেসান্তের ভবনে, মিসেস মার্টিনের বাড়িতে মার্গারেট শুনলেন বিবেকানন্দর আরো কয়েকটি বক্তৃতা। য়্যানি বেসান্তের বাড়িতে শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন ইংলণ্ডের দার্শনিক আর জ্ঞানী ব্যক্তিরা। সেখানে স্বামীজী ঈশোপনিষদ্ থেকে সেই বিখ্যাত শ্লোকটি, "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" ব্যাখ্যা করে তার নিগূঢ় মর্মকথা শোনালেন সবাইকে। মিসেস মার্টিনের বাড়িতে মার্গারেট তাঁকে দেখলেন এক অভিনব বেশে—পরিধানে কালো রঙের পায়জামা, গায়ে কালো রঙের ভেস্ট, তার উপর বিলম্বিত আলপাকার

একটি চোগা, গলায় সাদা কলার, কিন্তু টাই নেই আর মাথায় একটা কালো মুসলমানি টুপি। দেবদূতের মতো সুন্দর সৌম্য উজ্জ্বল মূর্তি মুহূর্তমধ্যে সকলের নয়ন মন যেন আকর্ষণ করলো। তাঁর কণ্ঠস্বর তেমনই গম্ভীর আর তেজঃপূর্ণ। রূপে রূপে অপরূপ সেই মূর্তি মার্গারেটের মনে এঁকে যায়—কিছুতেই ভুলতে পারেন না তিনি সেই নয়নলোভন ছবি। তাঁর জীবন, তাঁর জগৎ যেন এখন বিবেকানন্দময় হয়ে উঠেছে।

সিসেম ক্লাবের পক্ষ থেকে একদিন নিমন্ত্রণ করা হোল স্বামী বিবেকানন্দকে বক্তৃতা দেবার জন্যে। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, তাই এখানে তিনি ধর্মের কথা আলোচনা করলেন না। এখানে তিনি বক্তৃতা দিলেন শিক্ষা সম্পর্কে। এই বক্তৃতায় প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-প্রণালীর কথা আলোচনা করলেন তিনি। পরিশেষে তিনি বললেন, "শিক্ষা কেবল বই মুখস্থ করা নয়, শিক্ষা এক রকমের তপস্যা আর এই তপস্যার লক্ষ্য চরিত্রগঠন। শিক্ষার দ্বারা চরিত্র গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীতে আজ এইটাই দরকার। শিক্ষার একটি মাত্র সংজ্ঞাই আছে, তা এই: Education is the manifestion of the perfection already in man, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা বিদ্যমান, তাকেই জাগিয়ে তোলার নাম শিক্ষা।"

চমৎকার কথা, ভাবেন মার্গারেট।

সংশয়ের আর একটা পর্দা সরে গেলো।

তাঁর মুক্ত-মনের বাতায়ন পথে উদ্ভাসিত হয় এক নতুন চেতনা।

আর একদিনের কথা। সেদিন একটি ঘরোয়া বৈঠকে প্রশ্নোত্তর ক্লাস বসেছিল। শ্রোতারা প্রশ্ন করেন। স্বামীজী উত্তর দেন। কথায় কথায় হোল কিছু বাদানুবাদ। তারপর? সেদিনের স্মৃতি প্রসঙ্গে নিবেদিতা নিজেই বলেছেন: "হঠাৎ বজ্রপাতের মতো আমাদের

সবাইকে চমকে দিয়ে আচার্যদের বলে উঠলেন, "আজ পৃথিবীতে কিসের অভাব জানো? পৃথিবী চায় এমন কতকগুলি নর-নারী যারা রাস্তার ওপর এসে বুকে হাত দিয়ে বলবে, ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের আপনার বলতে আর কেউ নেই। তোমাদের মধ্যে কেউ প্রস্তুত?"

সঙ্গে সঙ্গে মার্গারেটের মনে উঠল প্রতিধ্বনি—"পৃথিবী চায় এমন কতকগুলি নর-নারী"—ভাবেন, এই ক'জনের মধ্যে তিনি কি একজন হোতে পারেন না? সন্ন্যাসীর এই আহ্বান আজ তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করলো। কুমারী-মনে জেগে ওঠে সংকল্প: আমার সমগ্র জীবন মানুষের কল্যাণে বিলিয়ে দেব।

তারপর একদিন মার্গারেট একাকী এসে দেখা করলেন সন্ন্যাসীর সঙ্গে। বললেন তাঁর মনের কথা। সব কথা শুনে স্বামীজী তাঁকে বললেন, "খুব ভালো কথা। তুমি আমাদের দেশে যেতে চাও, সেখানকার মেয়েদের সেবা করতে চাও—এ তো মহৎ কাজ। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, কিন্তু আমার মনের সাধ কি জানো? দরিদ্র নারায়ণের সেবা করা, তাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করা। আমার ইষ্টদেব আমাকে মুক্তির শিক্ষা দেননি—দিয়েছেন এই শিক্ষা যে, অনাথ দীন-দরিদ্রের সেবাই ভগবানের প্রকৃত সেবা, জীবনের চরম চরিতার্থতা।"

মার্গারেটের জীবন-বীণার তারে তারে ঝঙ্কৃত হয় এক নতুন রাগিণী। অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন কোন্ অজানিতের আহ্বান সেবা! সেবা-ই তো জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, মনের মধ্যে দাগ কাটলো সন্ন্যাসীর এই কথাটি। এমন কথা তিনি আগে শোনেন নি।

একদিন বিকেলের আসরটা বেশ জমে উঠেছে। কথা কইতে কইতে হঠাৎ স্বামীজী মার্গারেটের দিকে ফিরে বলে উঠলেন: "স্বদেশে মেয়েদের শিক্ষার জন্যে একটা পরিকল্পনা করেছি আমি, মনে হয় তোমার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাব। তুমি কি

দাঁড়াবে আমার পাশে আমার এই সংকল্পকে রূপ দিতে? যাবে আমার দেশে?"

—যাব। আপনার কাজে উৎসর্গ করব নিজেকে।

—মুখে শুধু বললে হবে না। এর জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে তোমাকে।

—রাজী। সর্বস্ব ত্যাগ করতে রাজী আছি আমি।

—মনে করে দেখো সব কিছু ছেড়ে যেতে হবে তোমাকে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আর এই নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা, সব কিছু ত্যাগ করতে হবে। দরিদ্র দেশ আমার; দারিদ্র্যের মধ্যে দুঃখকষ্ট করে দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়ে থাকতে হবে। পারবে তুমি?

—পারব। কুমারীর কণ্ঠস্বর অকম্পিত।

১৮৯৬ সালের অক্টোবর মাসে বিবেকানন্দ লণ্ডন ত্যাগ করলেন। যাবার আগে মার্গারেটকে একখানি পত্র লিখলেন। সেই চিঠিতে তিনি তাঁকে বলেছিলেন: "আমার এই নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে, তোমার মন সমস্ত সংস্কার থেকে মুক্ত, তোমার মধ্যে আছে সেই শক্তি যা এই পৃথিবীকে নাড়া দিতে পারে···জাগো, জাগো, মহাপ্রাণ। আমার কথা, শুধু, জাগো, জাগো।"

জেগে উঠলেন কুমারী এলিজাবেথ মার্গারেট নোবল। তাঁর মনের মধ্যে এখন এই ধারণা দৃঢ় হোলো যে, ভারতবর্ষই তাঁর আসল দেশ। ভারতবর্ষের বেদীমূলে নিবেদন করলেন তিনি নিজেকে। সেইদিন থেকে মার্গারেটের হোলো নবজন্ম।

তিনি হোলেন নিবেদিতা।
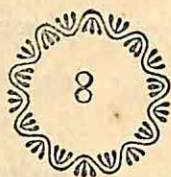
—মা, আমি ভারতবর্ষে যাব, তুমি মত দাও।

—বেড়াতে যাবি? বেশ তো, এরজন্যে আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন?

—না মা, বেড়াতে নয়। আমি সেই দেশে গিয়ে চিরকালের জন্যে বাস করব। সেই দেশের সেবায় উৎসর্গ করব আমার জীবন, বিলিয়ে দেব নিজেকে। তুমি আশীর্বাদ কর।

—কোথায় যাবি? কার সঙ্গে যাবি?

—আমি যাঁকে গুরু বলে গ্রহণ করেছি তাঁর সঙ্গে যাব। স্বামী বিবেকানন্দের চরণে আমি যে আশ্রয় নিয়েছি।

—ও, সেই হিন্দুযোগী। এ যে আমার কত বড়ো সৌভাগ্য, মার্গারেট। তিনি তোকে তাঁর দেশের মেয়েদের কাজের জন্যে গ্রহণ করেছেন, এ-কথা তো বলিস নি আমাকে?

—বলিনি, পাছে তুমি মনে দুঃখ পাও, রাগ কর।

—না, দুঃখ পাব কেন? তবে আজ তোকে একটা কথা বলি। তোর জন্মের আগেই আমি তোকে ভগবানের চরণে সঁপে রেখেছি। আর তোর বাবা মারা যাবার সময় কী বলে গিয়েছিলেন, জানিস তো? তবে আর রাগ করব কেন? এ যে আমার কত বড়ো আনন্দ, মার্গারেট।

—সত্যি বলছ মা? তুমি আমার খুব ভালো মা, এই বলে আনন্দে মেয়ে মায়ের হাত দুখানি জড়িয়ে ধরে স্নেহভরে।

—তুই চলে যাবি, ওদেশে গিয়ে থাকবি ; তবে খোঁজ-খবর নিস আমার মাঝে মাঝে। আর যেখানেই থাকিস, আমার অন্তিম সময়ে একটিবার এসে দাঁড়াস আমার কাছে।

মায়ের অনুমতি নিয়ে মার্গারেট এলেন ভারতবর্ষে।

তখন উনবিংশ শতাব্দী শেষ হয়-হয়।

ভারতবর্ষে এলেন কুমারী নোবল। পেছনে পড়ে রইল আত্মীয়-স্বজন, সব কিছু। পড়ে রইল লণ্ডনের সেই সুসভ্য পরিবেশ, সেই নিরুদ্বেগ আশ্রয়। সব কিছু ছেড়ে তিনি আলিঙ্গন করলেন দুঃখ-দারিদ্র্যকে। গুরু বলেছিলেন, "আমার দেশে যেতে চাও, সে-দেশ গরীব, সে দেশের লোকেরা গরীব—পারবে তাদের তাদের মাঝখানে গিয়ে বাস করতে?"

তিনি তো তাঁকে সহজে গ্রহণ করেন নি। বলেছিলেন: "তোমাকে তোমার আগের জীবন, আগের সংসার, পুরাতন অভ্যাসের স্মৃতি সব কিছু মুছে ফেলতে হবে। অনুভব করতে হবে মনে প্রাণে যে তুমি ভারতবর্ষের সন্তান, ভারতবাসীই তোমার জাতি।"

মার্গারেট রাজী হয়েছিলেন। গুরু তাঁর কানে তখন দিলেন ভারতমন্ত্র। "এই ভারতমন্ত্রই তোমার জপের মন্ত্র হোক", বলেছিলেন বিবেকানন্দ তাঁর মানসকন্যাকে ইংলণ্ড ত্যাগ করবার ঠিক দু'দিন আগে। সেই মন্ত্রকে কণ্ঠে ধারণ করেই মার্গারেট এলেন ভারতবর্ষে ১৮৯৮ সালের ২৮শে জানুয়ারি।

এলিজাবেথ মার্গারেট নোবল—এই নামটা মুছে গেল তাঁর জীবনের পট থেকে।

সেখানে অঙ্কিত হোল এক নতুন নাম, সুন্দর নাম—"নিবেদিতা"।

কালের অক্ষয় শিলার ওপর এই নামটিই ক্ষোদিত হয়ে আছে।

এখন থেকে তিনি ভারত-দুহিতা নিবেদিতা। বিবেকানন্দ স্বয়ং এই নামটি দিয়েছিলেন তাঁকে। শুধু তাই নয়, সেই নবজন্মের পুণ্যক্ষণে স্বামীজী নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করলেন এইভাবে:

জননী-হৃদয় আর সংকল্প বীরের
মধুময় সুখস্পর্শ মৃদু মলয়ের,
দীপ্ত শিখা বাধাহীন আর্যবেদী মাঝে
যে পুণ্য মাধুর্য রাজে যে শক্তি বিরাজে,
ভাষাতীত স্বপ্নাতীত যাহা আছে আর—
তোমাতে বিলীন হোক—হউক তোমার॥

সেই সঙ্গে শিষ্যার কাছ থেকে গুরু আশা করলেন:

ভবিষ্যভারত যেন তোমা মাঝে পায়
একাধারে শিক্ষা-গুরু সেবক সখায়।

নিবেদিতার পরবর্তী জীবনে এর প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। ভারতবর্ষের সেবাতেই এই বিদেশিনী নিজেকে বিলিয়ে দিলেন সেইদিন থেকে। সেবা ও তপস্যার ভেতর দিয়েই তাঁর জীবন দিনে দিনে কিভাবে সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠেছিল, এইবার আমরা সেই কাহিনী আলোচনা করব।

নিবেদিতা এখন নবজীবনের তপস্বিনী।

এই তপস্বিনীর স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ।

তাঁর সেই নবজন্মের মুহূর্তে ভারতের কল্যাণের জন্য তাঁকে উৎসর্গ করে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে আরো বললেন: "যদি আমার নিজের কোনো অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য তোমাকে আমি বলিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই বলি বৃথা হউক; আর যদি ইহার মূলে সেই পরমাশক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সার্থক হও, তোমার জয় হউক"

সত্যই এক অচিন্ত্য পরমাশক্তির ইচ্ছাই যেন এই মহিয়সী বিদেশিনীকে এই পুণ্যভূমিতে টেনে এনেছিল সেদিন। সত্যই ইংলণ্ডের উদ্যান থেকে যে অনাঘ্রাত শুভ্র কুসুমটি সন্ন্যাসী চয়ন করে এনেছিলেন, সেই ফুলটি ভারতমাতার চরণে অর্পিত হয়ে কিভাবে তিলে তিলে শুকিয়ে গিয়েছিল, সে-কাহিনী বাংলার জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। সেইজন্যই কি বিবেকানন্দ বলতেন: "Nivedita is the fairest flower of my work in England"—বর্ণে বর্ণে সত্য এই কথা। যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিবেকানন্দ এই ফুলটিকে ভারতমাতার চরণে নিবেদন করেছিলেন, যে অভিপ্রায়ে এই জীবন্তবেদান্তী, এই সিংহিনী-সমা মহিলাকে তিনি এদেশে এনেছিলেন, তা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছিল। "ভারতবর্ষ আমার দেশ, ভারতবাসী আমার প্রিয়জন"—এই কথা তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে বলতে পেরেছিলেন নিবেদিতা।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখনো বেলুড় মঠ তৈরি হয়নি। ঐখানে গঙ্গার তীরে নীলাম্বর মুখার্জির এক বিরাট বাগান ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ সেখানেই থাকতেন। এইখানেই প্রথম প্রথম নিবেদিতার থাকবার ব্যবস্থা হোলো। যে সময়ে ইংলণ্ড থেকে নিবেদিতা আসেন, সেই একই সময়ে আমেরিকা থেকে আরো দুজন বিদুষী মহিলা এই দেশে আসেন। তাঁদের নাম শ্রীমতী ওলিবুল ও কুমারী জোসেফাইন ম্যাকলাউড। এঁরা দুইজনেই স্বামীজীর শিষ্যা ছিলেন। এঁরা এসেছিলেন তাঁদের আচার্যদেবের জন্মস্থান দেখতে এবং আরো ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর পুণ্যসঙ্গ লাভের দ্বারা তাঁদের নিজ নিজ জীবন ধন্য করতে। শ্রীমতী ওলিবুল বেলুড় মঠ নির্মাণের জন্য গুরুর চরণে কিছু অর্থও প্রদান করেছিলেন। নিবেদিতাকে তিনি ঠিক নিজের মেয়ের মতন দেখতেন। বয়সেও অনেক বড়ো ছিলেন তিনি। এই

বিদেশিনী শিষ্যাদের এইখানেই থাকার ব্যবস্থা হোলো। স্বামীজী প্রতিদিন তাঁদের উপদেশ দিতেন। স্বীয় মানস-দুহিতা নিবেদিতাকে তৈরি করাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ।

১৮৯৮ সালটা এইভাবেই কেটে যায়।

গুরুর কাছে নিবেদিতা এই সময়ে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তাতেই তাঁর জীবন সুন্দরভাবে গঠিত হয়। একজন ভাস্কর যেমন অসীম ধৈর্যের সঙ্গে, যত্নের সঙ্গে একটি প্রস্তর খণ্ড থেকে প্রতিমা নির্মাণ করে এবং অন্তরের ঐশ্বর্য ঢেলে দিয়ে সেই মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, স্বামী বিবেকানন্দও তেমনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে, যত্নের সঙ্গে নিবেদিতাকে শিক্ষা দিয়ে, উপদেশ দিয়ে মনের মতন করে গড়ে তুলেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনেক অসমাপ্ত কাজ নিবেদিতাকে করতে হবে। এই শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল একটি নির্দিষ্ট প্রণালীতে। একদিন নিবেদিতা প্রশ্ন করলেন—আমি কেমন করে ভারতবর্ষের সেবা করতে পারি, স্বামীজী?

—ভারতবর্ষকে ভালোবেসে, উত্তর দিলেন বিবেকানন্দ।

নিবেদিতাকে একান্তভাবে ভারতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত করাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। প্রতিদিন কুটীরে কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন বিবেকানন্দ। সম্মুখে গঙ্গা, গঙ্গার ধারে কুটীরখানিকে ঘিরে ছায়াশীতল কত গাছপালা। তারই পাদমূলে বসে গুরু তাঁর কন্যাকে শিক্ষা দিতেন—অতি সহজ ভাষায় ভারতবর্ষের আচার অনুষ্ঠান, ইতিহাস, উপকথা, জাতি, জাতীয়ভাব, রীতিনীতি সবই আলোচনা করতেন। নিবেদিতা শুনতেন সেসব গভীর আগ্রহের সঙ্গে; যা শুনতেন তা তাঁর হৃদয়ে চিরকালের মতো গেঁথে যেত। এমনি-ভাবেই নিবেদিতার মানসপটে এঁকে গিয়েছিল হিন্দুর অতীত ও বর্তমান জীবনের ছবিটি। কখনো বা প্রাচীন কাব্য থেকে, কখনো

পুরাণ ও মহাকাব্য থেকে দু'একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে সেই ছবিকে বার্ণাঢ্য করে তুলতেন তিনি নিপুণ শিল্পীর মতন। এমনি করেই গুরুর চরণ-প্রান্তে বসে শিক্ষালাভ করতে করতে বিদুষী নিবেদিতা পরিচিত হলেন শুধু ভৌগোলিক ভারতবর্ষের সঙ্গে নয়, একেবারে ভারতবর্ষের আত্মার সঙ্গে।

দিন যায়। গুরুর নিকটে শিক্ষালাভ করতে করতে মার্গারেট হয়ে ওঠেন নিবেদিতা। অদ্ভুত শিক্ষক স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শিষ্যার মনে যত ভ্রান্ত ধারণা ছিল তা যেমন দূর করে দিলেন, তেমনই আবার হিন্দু সমাজের মধ্যে যত ভেদ-বৈষম্য বা আবর্জনা আছে, তার কথাও নিঃসংকোচে বলতেন তিনি নিবেদিতাকে। হিন্দু ধর্মের যে অংশ তাঁর কাছে দুর্বোধ্য বা অর্থহীন মনে হোত, তিনিও নিঃসংকোচে গুরুকে তা জানাতেন। তিনি নতুন এসেছেন এই দেশে, সব জিনিস সহজে বুঝতে পারতেন না। হিন্দুর ধর্মাদর্শ, উপাসনা-পদ্ধতি এবং জীবনের গতি ও সেই সম্বন্ধে বিশ্বাস, এই বিদেশিনীর কাছে সময়ে সময়ে দুর্বোধ্য মনে হোত। শিষ্যা সরল মনে প্রশ্ন করতেন আর গুরু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নিবেদিতার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তার কৌতূহল নিরসন করতেন। এমন যত্নের সঙ্গে পৃথিবীতে কোনো আচার্য কোনো শিষ্যকে শিক্ষা দিয়েছেন কি না সন্দেহ। ধৈর্যচ্যুতি নেই, অসহিষ্ণুতা নেই, এমন কি একই প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞাসা করলেও বিরক্ত হতেন না বিবেকানন্দ—কখনো বলতেন না, এ প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। যত অকিঞ্চিৎকরই সেই জিজ্ঞাসা হোক না কেন, বিন্দুমাত্র অবহেলা বা ঔদাসীন্য দেখাতেন না তিনি, বা উপহাস করে উড়িয়ে দিতেন না।

কেন এত যত্ন নিতেন বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্যার শিক্ষার জন্যে? কারণ তিনি জানতেন, নিবেদিতাকে দিয়ে অনেক কাজ করাতে হবে। হয়ত তিনি তখন ইহলোকে বর্তমান থাকবেন না, তখন যাতে তার

কোনো অসুবিধা না হয়, সেইজন্যই তিনি এমন করে তাঁকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তা ছাড়া, পাশ্চাত্যের ভাব প্রাচ্যের ভাব থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র, একের জন্ম-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা অন্যের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কার থেকে এমনই পৃথক যে, বিবেকানন্দ প্রতিটি সামান্য কথা অশেষ ধৈর্যের সঙ্গে বার বার বুঝাতে ক্লান্তি বোধ করতেন না। তবে-ই না মার্গারেট হতে পেরেছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতাকে শিক্ষা দিতে গিয়ে স্বামীজী প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সমন্বয় সাধন করলেন। কেনই বা তিনি শিষ্যার মন প্রাচ্যের ছাঁচে ঢেলে গঠন করতে চাইলেন ? এর উত্তরে বলা যায় যে, তিনি জানতেন তাঁর এই শিক্ষা দ্বারা এদেশের কোনো কাজ করাতে হলে, এই দেশের উপর এবং এই দেশের লোকের উপর তার আস্থা এবং মমতা থাকা দরকার। নতুবা তাঁর পক্ষে তনুমন নিবেদন করে এদেশের কাজ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। নিবেদিতা যে সখ করে বা কৌতূহলের বশে এদেশে আসেন নি, সেটা বিবেকানন্দ পরীক্ষা করে নিতে চেয়েছিলেন। সেইজন্যই প্রথম এক বছর এই রকম কঠিন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাইতো একদিন সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে নিবেদিতাকে বললেন বিবেকানন্দ, "যদি তোমাকে ভারতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হয় তবে তোমাকে পুরোপুরি ভারতীয়ভাবে চলতে হবে, এমন কি খাওয়া-দাওয়া চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা সব বিষয়েই হিন্দুভাবাপন্ন হতে হবে। মেয়েদের শিক্ষার ভার তোমার ওপর দেব ঠিক করেছি, তুমি পারবে ?"

—পারব, স্থির ও প্রশান্ত উত্তর এলো নিবেদিতার কাছ থেকে।

—তোমাকে এখন চিন্তায়, ভাবে, অভ্যাসে ও প্রয়োজনে হিন্দু হতে হবে। পারবে তুমি গার্গী-মৈত্রীর মতন ব্রহ্মচারিণীর আদর্শে

নিজেকে গঠন করতে? মহাজীবনের আহ্বানে ভারতের নারী যুগে যুগে যেমন সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, তুমি কি সে রকম পারবে?

—পারব, আবার দৃঢ়কণ্ঠে বলেন নিবেদিতা।

—বেশ। কিন্তু তোমার অতীত জীবনটাকে একেবারে ভুলতে হবে, এমন কি তার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত থাকবে না। আমাদের দেশের সভ্যতার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে পারবে না। য়ুরোপীয় সভ্যতার গর্ব করে, এদেশের লোককে করুণার চক্ষে দেখতে পারবে না। আর্ত ও দুঃস্থের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে হবে। জীবনের সর্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে বহুজন হিতায়—এই আদর্শ বেছে নিতে হবে। আর এই ভারতবর্ষকে তোমার জননী ও ধাত্রী বলে জ্ঞান করতে হবে। বলো, পারবে?

—পারব।

এরপর ১৮৯৮ সালের ১৬ই মার্চ, বিবেকানন্দ মার্গারেট নোবলকে ব্রহ্মচারিণী ব্রতে দীক্ষিত করলেন। গুরু তাঁর নতুন নামকরণ করলেন "নিবেদিতা"। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন অদ্ভুত ঘটনা এর আগে আর কখনো ঘটেনি। নিবেদিতার আগে কোনো পাশ্চাত্য নারীই এমনভাবে গোত্রান্তরিত হয়ে সন্ন্যাসিনী সাজেন নি। তারপর গুরু তাঁকে উৎসর্গ করলেন ভারতের বেদীমূলে—তাঁর ললাটে এঁকে দিলেন নতুন পরিচয়—ভগিনী নিবেদিতা। মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ নব-দীক্ষিতা এই বিদেশিনীকে 'ভগিনী' বলে পরম প্রীতিভরে গ্রহণ করলেন। সেদিন থেকে নিবেদিতা 'ভগিনী নিবেদিতা' রূপে আমাদের কাছে পরিচিতা হয়ে উঠলেন।

গুরুর কাছে তিনি কিরূপ শিক্ষালাভ করেছিলেন তার স্মৃতিকথা নিবেদিতা এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'দি মাষ্টার য়্যাজ আই স হিম' বইতে। তিনি লিখেছেন: "আমরা যেখানে বাস করতাম সেই বাড়িটি কলিকাতা থেকে কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম

তীরে এক উঁচু সমতলভূমির উপর অবস্থিত ছিল। বাড়িখানা খুবই পুরানো ছিল। গঙ্গার পূর্বতটে আরো এক মাইল দূরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ও গাছের চূড়াগুলি দেখা যেত। স্বামীজী প্রতিদিন সকালে একাকী, কখনো বা অন্য গুরুভাইদের সঙ্গে আসতেন। এইখানেই ছায়াস্নিবিড় বৃক্ষতলে আমাদের তিনি শিক্ষা দান করতেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা বসে বসে একমনে তাঁর মুখের কথা শুনতাম। শুনতাম আর সবিস্ময়ে ভাবতাম ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়ে কী অসাধারণ তাঁর পাণ্ডিত্য। আমাদের গৃহস্থালীর ভার ছিল মঠের একজন ব্রহ্মচারীর উপর। আর একজনের উপর বাংলা শেখাবার ভার ছিল।"

শীঘ্রই নিবেদিতার অগ্নিপরীক্ষার সময় এলো। এপ্রিলের শেষে কলিকাতায় হঠাৎ প্লেগ দেখা দিল। সাংঘাতিক মহামারী এই প্লেগ। বিবেকানন্দ তখন দার্জিলিঙ-এ ছিলেন বিশ্রামের জন্যে। প্লেগের খবর পেয়ে পাহাড় থেকে নেমে এলেন তিনি এবং শহরে এসে প্লেগ রোগে আক্রান্ত রোগীদের সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করতে সচেষ্ট হলেন। নিবেদিতা এসে দাঁড়ালেন গুরুর পাশে। সঙ্গে সঙ্গে পীড়িতের সেবার জন্য বিবেকানন্দের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশন অগ্রসর হোলো।

একজন গুরুভাই জিজ্ঞাসা করেন—টাকা কোথায়?

—টাকার জন্যে ভাবনা কি? দরকার হলে মঠের জমি-জায়গা সব বেচে দেব। আমরা ফকির, মুষ্টি-ভিক্ষা করে গাছতলায় আমরা দিন কাটাতে পারি। যদি জায়গা-জমি বেচলে হাজার-হাজার লোকের জীবন রক্ষা হয়, তবে কিসের জায়গা আর কিসের জমি?—বললেন দৃপ্ত কণ্ঠে বিবেকানন্দ। নিবেদিতা শুনলেন এই কথা। গুরুর এক নতুন রূপ দেখতে পেলেন যেন তিনি। ঈশ্বর-প্রেমিক এই

সন্ন্যাসী যে কতবড়ো মানব-প্রেমিক তা তিনি বুঝতে পারলেন। অনুপ্রাণিত হলেন তিনি। নিজে ঝাড়ু হাতে নামলেন রাস্তা পরিষ্কার করতে। বিবেকানন্দ সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁর কন্যা শুধু কর্মী নন, যেন মূর্তিমতী সেবা। ভারতবর্ষে আসবার তিনমাস পরেই ভগিনী নিবেদিতা নিজের জীবন উপেক্ষা করে প্লেগ রোগীদের সেবায় যে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করবেন, এ যেন তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন নি। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি পরে লিখেছিলেন, "১৮৯৮ সালের প্লেগের সময় কলিকাতায় কী আতঙ্ক। শহরে এই মহামারী সেই প্রথম। একদিন বাগবাজারের রাস্তায় দেখলাম ঝাড়ু ও কোদাল হাতে এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা নিজেই রাস্তার ময়লা পরিষ্কার করতে নেমেছেন। পরে শুনলাম তিনি ভগিনী নিবেদিতা। নাগরিক জীবনে স্বাবলম্বন শিক্ষার প্রথম পাঠ আমরা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম।"

একদিন সঙ্ঘ জননী সারদা দেবী বেলুড়ে এলেন। বৈশাখ মাস, দারুণ গরম। মা এসে বসলেন ঠাকুরঘরের দালানে। সন্তানেরা ঘিরে বসল তাঁকে, হাত-পাখা দিয়ে বাতাস করেন একজন। বিবেকানন্দ সঙ্গে করে নিয়ে এলেন নিবেদিতাকে। পরিচয় করিয়ে দিলেন মায়ের সঙ্গে। নিবেদিতা আভূমি নত হোয়ে প্রণাম করেন সারদা দেবীকে। তিনি তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। যতই তাঁকে চেয়ে দেখেন, ততই যেন নিবেদিতা বিস্মিত হন। বিস্মিত এবং মুগ্ধ। ইনিই রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী! ভাবেন তিনি মনে মনে। কী সহজ, কী সরল আর কী মধুর। মমতার প্রাণময়ী প্রতিমা। যেন পুঞ্জীভূত পবিত্রতা। নিবেদিতার সমস্ত অন্তর শ্রদ্ধায় ভরে উঠলো। সারদা দেবীর অসীম স্নেহ পেয়েছিলেন নিবেদিতা। তিনি তাঁকে আদর করে 'খুকী' বলে ডাকতেন।

দিন যায়। নিবেদিতার শিক্ষা ও সাধনা চলে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। তিনটি বিদেশিনী মেয়ে—নিবেদিতা, ধীরামাতা (ওলিবুল) যোসেফাইন—যেন তিনটি তপস্বিনী। বাগানবাড়ির যে দিকটায় তাঁরা বাস করতেন তার সামনে ছিল একটা পুকুর, পুকুরের ধারে অজস্র ফুল। সকালে স্বামীজী চা খেতে আসতেন এখানে—বড়ো একটা আমগাছের তলায় বসে তিনি চা খেতেন। বিকেল-বেলায় ঘরের সামনে আবার চায়ের মজলিশ বসত। এমনি করেই কেটে গেল প্রথম তিন মাস তারপর ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপের সঙ্গে শিষ্যার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে মে মাসের মাঝামাঝি নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে বিবেকানন্দ উত্তর-ভারত ভ্রমণে বেরুলেন।
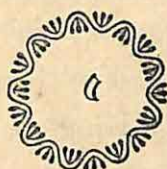
নিবেদিতা লিখেছেন : "মে মাসের প্রথম থেকে অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত আমরা কী অপরূপ দৃশ্যাবলীর মধ্যে দিয়েই না গিয়েছি। আর যেমন আমরা একটার পর একটা নতুন জায়গায় আসতে লাগলাম কী অনুরাগ আর উৎসাহের সঙ্গেই না স্বামীজী আমাদের সেখানকার প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বিষয়টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। প্রাচীন পাটলীপুত্র থেকেই এ-বিষয়ে শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল। রেলযোগে পূর্ব দিক থেকে কাশীতে প্রবেশ করবার মুখে তার ঘাটগুলির যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তা পৃথিবীর দর্শনীয় দৃশ্যাবলীর অন্যতম। স্বামীজী সাগ্রহে এর প্রশংসা করতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাটলীপুত্র ও বারাণসীর অতীত সমৃদ্ধি এবং গৌরবের বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে ভুললেন না। তারপর আমরা যখন লক্ষ্ণৌতে পেঁছিলাম তখন যেসব সুন্দর সুন্দর শিল্প দ্রব্য ও বিলাস দ্রব্য এখানে তৈরী হয় তিনি তাদের নাম ও গুণ বর্ণনা করলেন এবং সেই সঙ্গে লক্ষ্ণৌ-র নবাবদের অধুনাবিলুপ্ত কীর্তিকথা অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলেন।...আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত ক্ষেত, খামার, গ্রামবহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করবার সময় তাঁর প্রেম যেমন উথলে উঠত, অথবা তন্ময়তা যেরূপ প্রগাঢ় হোয়ে উঠত এমন আর বোধহয় কোথাও হয়নি। এইখানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে এক অখণ্ডভাবে চিন্তা করতে পারতেন আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে

ভাগ-চাষের নিয়ম অথবা কৃষক-বধূর প্রাত্যহিক জীবনের বর্ণনা করতেন—কোনো খুঁটিনাটি বাদ যেত না।... সময়ে সময়ে মনে হোত যেন স্বদেশের অতীত গৌরববোধই স্বামীজীর ষোল আনা মনপ্রাণ অধিকার করে রয়েছে। একদিন বিকেলবেলায় গ্রীষ্মের উত্তপ্ত বাতাসের মধ্য দিয়ে তরাই প্রদেশ অতিক্রম করছিলাম, সেই সময়ে তিনি আমাদের যেন প্রত্যক্ষ করিয়ে দিলেন যে, এই সেই ভূমি যেখানে ভগবান বুদ্ধের কৈশোর অতিবাহিত ও বৈরাগ্যলীলা প্রকটিত হয়েছিল। ভারতের প্রত্যেকটী গ্রাম, প্রত্যেকটি বৃক্ষ, এমন কি একটি সামান্য প্রাণী পর্যন্ত তাঁর মনে স্বদেশপ্রেমের ভাব জাগিয়ে তুলতো।"

অবশেষে তাঁরা এলেন নৈনীতাল। উত্তরপ্রদেশের একটি অতি মনোরম স্থান—প্রকৃতির রম্য নিকেতন যেন। পাহাড় আর গাছ দিয়ে ঘেরা এই পার্বত্য দেশটি দেখে মুগ্ধ হলেন নিবেদিতা। এখানকার একটি দেব মন্দিরে প্রতিমা ও আরতি দেখলেন। মন তাঁর ভরে উঠল এক স্বর্গীয় চিন্তায়। কী সুন্দর দেশ এই ভারতবর্ষ—সত্যই যেন দেবভূমি। যতই এর প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং যতই তিনি এর রূপৈশ্বর্য প্রত্যক্ষ করেন, ততই নিবেদিতার মন যেন ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধায় এবং বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হোয়ে উঠতে থাকে।

নৈনীতাল থেকে তাঁরা এলেন আলমোড়া। এইখানে শ্রীমতী য়্যানি বেসান্তের ভবনে বিবেকানন্দ দু'দিন গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন নিবেদিতা। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই বিদেশিনী আইরিশ মহিলার দান অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। আমাদের মুক্তি-সংগ্রামে তিনি এক গৌরবজনক অংশ গ্রহণ করে এই দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের ইনি একবার সভানেত্রী নির্বাচিতা হয়েছিলেন এবং তখনকার ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে ইনি কিছুকাল নির্বাসন দণ্ড পর্যন্ত ভোগ করেছিলেন। বেসান্ত

ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামে যে রকম সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন তা তাঁর আগে আর কোনো বিদেশিনী মহিলা দেখাতে পারেননি। তিনিও এই দেশকে তাঁর নিজের দেশ বলে মনে করতেন এবং ভারতবর্ষে থিওজফিক্যাল সোসাইটি নামে যে ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বেসান্ত ছিলেন তার পরিচালিকা। বিবেকানন্দ বেসান্তের অনুরাগী ছিলেন, নিবেদিতার সঙ্গে তিনি তাই বেসান্তের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এই আলমোড়ার নিভৃত শান্ত পরিবেশে শিষ্যাকে তিনি দেশ-বিদেশের ইতিহাসের পাঠ দিতেন। অসীম আগ্রহের সঙ্গে তিনি সেই সব পাঠ গ্রহণ করতেন। তাঁর গুরুর ইতিহাস-জ্ঞান যে কতদূর বিস্তৃত আর গভীর তা দেখে নিবেদিতার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকত না। একদিন ইতালির কথা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বললেন—"ধর্ম ও শিল্পের দেশ এই ইতালি—য়ুরোপে এর জুড়ি নেই। স্বাধীনতা শিক্ষা এবং ভাবের জননী ইতালি আমার নমস্য দেশ।" তাঁর গুরু যে শুধু স্বদেশের গৌরবের কথা-ই বলেন না, অন্য দেশের গৌরবের যে তিনি একজন সমঝদার, এই কথা জেনে নিবেদিতা খুশি হন। সন্ন্যাসীর এই উদার ভাব তাঁকে শিষ্যার প্রতি আরো শ্রদ্ধেয় করে তোলে।

আর একদিন কথায় কথায় বুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠল। হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মুখে নিবেদিতা শুনলেন: "আমি ভগবান বুদ্ধের দাসানুদাস। তাঁর সমতুল্য এ পর্যন্ত কে হোতে পেরেছে? তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর—নিজের জন্য কখনো একটি কাজ করেন নি। বিশাল হৃদয়ের দ্বারা সমগ্র জগতকেই আলিঙ্গন করেছেন। রাজপুত্র হয়েও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এমন করুণাঘন মূর্তি মানব-সভ্যতার ইতিহাসে বুঝি আর দ্বিতীয় নেই। জানো, ছেলেবেলায় আমি একবার বুদ্ধের দর্শন পেয়েছিলাম।"

বলতে বলতে তন্ময় হয়ে যান বিবেকানন্দ আর গুরুর মুখের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন নিবেদিতা। সেই বিশাল হৃদয়, সেই অপার্থিব করুণা আর প্রেম তো এঁরও মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। আর তাঁরই সান্নিধ্য লাভ করেছেন তিনি, তাঁর জন্ম সার্থক, মনে মনে ভাবেন নিবেদিতা। এমন ভাবে কত কথা, কত প্রসঙ্গের ভেতর দিয়ে গুরু ও শিষ্যার ভ্রমণের অবসরগুলি যাপিত হোতো। ইতিহাস পুরাণ কাব্য থেকে আরম্ভ করে দর্শন, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান কিছুই বাদ যেত না।

এবারকার ভ্রমণের শেষ গন্তব্যস্থল ছিল কাশ্মীর।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের দৃশ্যে নিবেদিতা যারপরনাই মুগ্ধ হলেন। পৃথিবীতে এমন সৌন্দর্য-নিকেতন বোধ হয় আর কোথাও নেই, তাঁর ধারণা হোলো। তাঁর কাশ্মীর-দর্শনের অভিজ্ঞতা নিবেদিতা এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "পথের দৃশ্য অতি রমণীয়। কোথাও কৃষক আপন মনে গান গেয়ে চলেছে, কোথাও সাধু-সন্ন্যাসীরা আঁকা-বাঁকা আর উঁচু-নীচু পথ দিয়ে দেব-মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলেছেন। পাহাড়ের নীচে কত বিচিত্র রঙের ফুলের গাছ। মাঝে মাঝে সবুজ উপত্যকা আর শ্যামল শস্যক্ষেত্র—চারদিকে চিরতুষারাবৃত পর্বতমালা; পর্বতের শিখরগুলি শাদা। পাহাড়ের গায়ে খোদাই-করা কত প্রাচীন কাহিনী, এখানে-ওখানে কত ধ্বংসস্তূপ। চারদিকে কি মৌন-মহিমা।"

কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ তুষারতীর্থ অমরনাথ। তুষারময় শিবলিঙ্গ এখানে বিরাজমান। বরফে ঢাকা দুর্গম পাহাড়ী রাস্তার ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে শত শত যাত্রী—কত সাধু-সন্ন্যাসী চলেছে অমরনাথের গুহাভিমুখে। সে এক অপরূপ দৃশ্য। সেই তীর্থযাত্রীদের মধ্যে আছেন বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা। এইখানেই নিবেদিতা যেন প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করলেন, দেবতার দর্শন-লাভের জন্যে এমন ব্যাকুলতা, এমন কষ্ট স্বীকার, এমন আগ্রহ বুঝি অন্য কোনো দেশে নেই। এইখানেই হিন্দুর হিন্দুত্ব।

অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে-ভরা সেই দীর্ঘ ও দুর্গম পথ অতিক্রম করে তাঁরা উপনীত হলেন অমরনাথ গুহার সম্মুখে। চারদিকে ছড়ানো বড়ো বড়ো পাথর—পাথরগুলির উপর তুষারের শ্বেত আস্তরণ। সম্মুখে সমুন্নত তুষারধবল শৃঙ্গরাজি আর বিশাল গুহাটির ভিতরে তুষারময় শিবলিঙ্গ। রৌদ্রের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তারপর গুহামধ্যে প্রবেশ করে নিবেদিতার মনে হোলো মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব যেন সশরীরে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এই তুষারলিঙ্গের পবিত্রতা ও ধবলতা তাঁকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করলো। এখানেও স্বামীজী তাঁর শিষ্যাকে জ্ঞাতব্য প্রত্যেক খুটিনাটির উল্লেখ করতে ভুললেন না।

অমরনাথ থেকে ক্ষীরভবানী—কাশ্মীরের আর একটি পবিত্র স্থান। এখানে জগন্মাতার পূজা হয়। এইখানেই তাঁর গুরু তাঁকে বলেছিলেন তাঁর চরম অনুভূতির কথা—"যেদিকে তাকাচ্ছি, কেবল মায়ের মূর্তি দেখছি আর সেই দেখার ফলে আমার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে বেজে উঠছে বিশ্বকাব্যের অনন্ত রাগিণী।" এই উপলব্ধি অভিব্যক্ত হোলো একটি কবিতায়। কবিতার নাম—'মৃত্যুরূপা মাতা'। ভাবের আবেশে রচিত এই কবিতাটির শেষের দু'লাইন এই রকম ঃ

সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ, মৃত্যুরূপা তারই কাছে আসে।

তারপর কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর। ঝিলমের তটে অবস্থিত এক আশ্চর্য দেশ। এইখানে তাঁর বিদেশিনী শিষ্যাদের নিয়ে বিবেকানন্দ কয়েকদিন নৌকায় অতিবাহিত করলেন। নৌকার তলদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে ঝিলমের মৃদু স্রোত। সকালবেলার স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে তার বুকে উঠেছে সফেন তরঙ্গ। অদূরে পর্বতমালা নীরবে দাঁড়িয়ে প্রহরীর মতো। নদীর ধারে ধারে ফলভারে অবনত সারি সারি পপ্‌লার চিনার ও আপেল গাছ। নৌকার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এই মনোরম দৃশ্য দেখেন আর নিবেদিতা

মনে মনে ভাবেন—সত্যই এ স্থান ভূ-স্বর্গ, য়ুরোপের সুইটজারল্যাণ্ডের দৃশ্য এর তুলনায় কিছুই নয়। স্বামীজী বাইরে এসে দাঁড়ালেন। নিবেদিতার জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল খুব সুমিষ্ট আর কথা বলতেন অত্যন্ত উৎসাহ এবং আগ্রহের সঙ্গে। নানা বিষয় সম্পর্কে তিনি একটার পর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চলেছেন, আর তেমনি অক্লান্তভাবে তার উত্তর দিয়ে চলেছেন বিবেকানন্দ। তাঁর প্রত্যেকটি উত্তর যেমন গভীর, তেমনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

এইখানেই একদিন গুরু তাঁর শিষ্যাকে পরম স্নেহভরে বললেন—"আমার দেশের লোককে তুমি যে ভালবাসতে শিখেছ, অমরনাথ থেকে ফিরবার সময় তার প্রমাণ পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি।" ঘটনাটা এখানে বলা দরকার। নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী সবেমাত্র অমরনাথ দর্শন করে ফিরছিলেন। বিবেকানন্দ, অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে পায়ে হেঁটেই চলেছেন। নিবেদিতা পাহাড়ী রাস্তায় হাঁটতে অনভ্যস্ত, তাঁর জন্যে একখানা ডাণ্ডীর ব্যবস্থা হয়েছে। কিছু পথ অতিক্রম করবার পর হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন যে, যাত্রীদের মধ্যে একটি বৃদ্ধা মহিলা অতি কষ্টে লাঠিতে ভর দিয়ে চলেছে। নিবেদিতা তখনি ডাণ্ডী থেকে নেমে এলেন এবং সেই বৃদ্ধাকে তার মধ্যে বসিয়ে বাকী পথ তিনি পায়ে হেঁটে অতিক্রম করলেন। স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখে, বিবেকানন্দ মনে মনে খুব খুশি হয়েছিলেন।

কাশ্মীর ভ্রমণ শেষ করে লাহোরের পথে নিবেদিতা গুরুর সঙ্গে নভেম্বরের প্রথমেই কলিকাতায় ফিরলেন।

১৮৯৮, ১২ই নভেম্বর।

দীপান্বিতার পুণ্যরজনী।

শিষ্যাকে আজ নতুন কর্মের দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর অনেকদিনের ইচ্ছা, মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি

আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করবেন। নিবেদিতাকে দিয়ে তাঁর সেই ইচ্ছা আজ চরিতার্থ হোলো। দীপান্বিতা উপলক্ষে শহরের প্রতি গৃহচূড়ে জ্বলছে সারি সারি প্রদীপের মালা। বাগবাজারের একটি ছোট্ট গলিতে নিবেদিতাও জ্বালালেন আলো। জ্ঞানের আলো। এখানে ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনে আজ বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করলেন মেয়েদের জন্যে একটি বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করলেন মাতা সারদাদেবী। গুরুভাইদের মধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। গুরুর সংকল্পকে রূপায়িত করে তুলবার পুণ্যব্রত গ্রহণ করলেন ভগিনী নিবেদিতা এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ব্রতাচরণে তাঁর ক্লান্তি ছিল না, ছিল না নিষ্ঠার অভাব। এই বিদ্যালয়ের নাম রাখলেন বিবেকানন্দ 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' আর ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনের সেই বাড়িটির নাম রাখা হোলো 'ভগিনী নিবাস'। নিবেদিতা এইখানেই থাকতেন। তিনিই হোলেন এই স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা। ছাত্রীরা সবাই তাঁকে ডাকতো 'সিষ্টার' বলে। মূর্তিমতী কল্যাণীরূপে বাগবাজারের সেই ছোট্ট গলিতে বাস করতে লাগলেন নিবেদিতা। সেইদিন থেকে আরম্ভ হোলো তাঁর জীবনে এক নতুন অধ্যায়। গুরুর ভারত-মন্ত্র এখন থেকে তাঁর জপের মন্ত্র। কাশ্মীরে অবস্থান করবার সময়ে একদিন গুরু তাঁর শিষ্যাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "স্কুল সম্বন্ধে বর্তমানে কি করবে স্থির করেছ?"

—আমি একাই স্কুল চালাবো; কোনো সহকারীর দরকার হবে না।

—একা পারবে কেন?

—খুব সামান্যভাবে আমি এই কাজ আরম্ভ করব এবং নিজেই নিজের প্রণালী বেছে নেব।

বিবেকানন্দ জানতেন লণ্ডনে নিবেদিতা নিজে একটি স্কুল চালাতেন এবং আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর বিশেষভাবেই জানা আছে।

সর্বোপরি তিনি বিদুষী, প্রতিভাময়ী আর অফুরন্ত তাঁর কাজ করবার ক্ষমতা। তাই তো তাঁকে তিনি এদেশে নিয়ে এসেছেন তাঁর স্বদেশের মেয়েদের কল্যাণের জন্যে।

নিবেদিতা লিখেছেন : "প্রথম থেকেই ঠিক ছিল যে, যত তাড়াতাড়ি হয় এবং সুবিধা হয় আমি কলিকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করব। কিন্তু স্বামীজী আমাকে এই কাজ আরম্ভ করবার জন্য তাড়া না দিয়ে, আমায় ভ্রমণ করবার ও মনে মনে ঐ কাজের জন্য প্রস্তুত হবার যথেষ্ট অবসর দিয়েছিলেন। আমি বেশ জানতাম যে, বিদ্যালয়টি খোলা হোলে এর দ্বারা প্রথমে শুধু এই পরীক্ষা হবে, কেমন ভাবে গড়ে তুললে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। মেয়েদের অভাব কি, তা আমার প্রথমে জানতে হবে। চারিদিকের পরিবেশের মধ্যে আমার স্থান কোথায়, তা নির্দ্ধারণ করতে হবে এবং যে সমাজের উন্নতিকল্পে আমার সকল চেষ্টা প্রয়োগ করব, তাকেও তন্ন তন্ন করে দেখতে হবে। কেবল একটামাত্র জিনিস আমার ঠিক করা ছিল—শিক্ষা সম্পর্কে এমন একটা উপায় আবিষ্কার করতে হবে যা ভারতবর্ষের মেয়েদের আধুনিক শিক্ষার পক্ষে যথার্থ উপযোগী হয়।"

এই আদর্শ নিয়েই আরম্ভ হয়েছিল নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়। স্কুল পরিচালনার জন্য একটি পরিচালক-মণ্ডলী গঠন করলেন তিনি। তখন থেকে তিনি বেলুড় ত্যাগ করে কলিকাতায় এসে বাস করতে লাগলেন। বাগবাজারে 'ভগিনী নিবাস'-এর কাছেই আরেকটা বাড়িতে থাকতেন সারদাদেবী। নিবেদিতা সময় পেলেই তাঁর কাছে আসতেন। কখনো কখনো গরমের সময়ে রাত্রিবেলায় তাঁর কাছেই শয়ন করতেন। "লাল সুরকির পালিশ-করা মেঝের উপর সারি সারি মাদুর বিছানো, তার উপর এক-একটি বালিশ ও মশারি, এই ছিল আমাদের শয়নের আসবাব।" সারদাদেবীর খুব কাছে

বাস করার ফল এই হয়েছিল যে, নিবেদিতা তাঁকে ভালো করে জানবার ও বুঝবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সংঘমাতার চরিত্রের মাধুর্য ও সৌন্দর্য দেখে তাঁর অন্তর শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হোয়ে উঠতো। সারদাদেবীর স্নেহের নিবিড় স্পর্শ পেয়ে তিনি নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করতেন। পরবর্তীকালে সারদাদেবী সম্পর্কে নিবেদিতা লিখেছিলেন, "আমার মনে হোতো ভারতীয় নারীকুলের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা তিনিই। কিন্তু তিনি কি এক পুরাতন আদর্শের শেষ দৃষ্টান্ত, অথবা এক নূতন আদর্শের প্রথম উদাহরণস্থল? খুব সরল স্বভাবের মেয়েদের মধ্যে যে গভীর জ্ঞান ও মাধুর্যের বিকাশ দেখা যায়, তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি সারদাদেবীর মধ্যে। তাঁর নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ, মন ছিল তেমনি উদার। তাঁকে সব সময়ে উদার ভাবের মত প্রকাশ করতে দেখেছি। তাঁর স্বভাবে আরো দুইটি বৈশিষ্ট্য ছিল—কোমলতা ও কৌতুকপ্রিয়তা। তিনি যে ঘরটিতে পূজা-পাঠ করতেন তা একটি পবিত্র মাধুর্যে ভরে থাকতো। আর দেখেছি তাঁকে সব সময়ে রামায়ণ পাঠ করতে।"

বিবেকানন্দের এই বিদেশিনী শিষ্যটিকে সারদাদেবীরও খুব ভালো লাগতো। তিনি বলতেন: "পূর্ব জন্মে খুকী এই দেশেরই মেয়ে ছিল।" তিনি সব সময়ে তাঁর 'খুকী'র খোঁজ নিতেন, কখনো কখনো অন্যান্য বয়স্ক মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর স্কুল দেখতে আসতেন। তাঁদের সকলকে সারদাদেবী গর্বের সঙ্গে বলতেন: "ও আর জন্মে কিছু ছিল। ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে বলেই ওদেশে জন্মেছে। নরেনকে কী ভক্তিই করে। নরেন এদেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে তার কাজ করছে। কী গুরুভক্তি। এদেশের উপরই বা কী ভালবাসা।"

একদিন নিবেদিতা এসে সারদাদেবীকে প্রণাম করলেন। মা তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর পশমের তৈরি একখানি ছোট

হাতপাখা তাঁকে দিয়ে বললেন—"খুকী এটা তোমার জন্যে করেছি।" নিবেদিতা যেন কৃতার্থ। পাখাটা পেয়ে একবার মাথায় ঠেকান, একবার বুকে রাখেন, আর বলেন—"কী সুন্দর, কী চমৎকার।"

—তোমরা সবাই ছাখো একটা সামান্য পাখা পেয়ে খুকীর কী আহ্লাদ। আহা কি সরল বিশ্বাস। বলেন সারদাদেবী অন্যান্য মেয়েদের উদ্দেশ করে।

আর একদিন বিকেলবেলার কথা। নিবেদিতা এসেছেন প্রণাম করতে। তখন বিবেকানন্দ আর ইহজগতে নেই। শ্রীমা তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন; তারপর বললেন ঃ—"খুকী, কাল রাতে তোমাকে আমি স্বপ্নে গেরুয়া-পরা অবস্থায় দেখেছি। তোমার তো সম্পূর্ণ দীক্ষা হয়নি। আমার কাছে দীক্ষা নেবে ?"

—নতুন করে আর গেরুয়া পরব না, মা। স্বামীজী আমাকে সন্ন্যাস দিয়ে গেছেন। তিনি আমাকে দিয়েছেন শিবমন্ত্র, আমি সেই ভাবেই চলব।

—কী অসাধারণ তোমার গুরুভক্তি, ধন্য মেয়ে তুমি, বলেন সারদাদেবী।

এমনই ছিল তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা।

স্কুলের কাজ নিয়ে নিবেদিতার দিন কাটে এখন।

তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ তিনি ঢেলে দিয়েছেন এর ওপর।

এই ছিল যেন তাঁর জীবন-সাধনা। সে সাধনা ছিল খুবই কঠিন। দুঃখ, অপমান, অভাব সব তুচ্ছ করে নিবেদিতা উত্তর কলিকাতায় বাগবাজারের সেই সঙ্কীর্ণ গলিটির মধ্যে কিভাবে নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় স্কুলটি গড়ে তুলেছিলেন, আজ এই সুদূরকালের ব্যবধানে আমরা সহজে তা ধারণা করতে পারব না। স্কুলের জন্যে ছাত্রী আনতে হয়েছিল অভিভাবকদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে। স্কুল চালাবার জন্যে টাকাও আনতে হয়েছে ভিক্ষা করে। শহরে প্লেগের সময় সেবাকর্মে শিষ্যার আত্মনিয়োগ স্বচক্ষে দেখেছিলেন বিবেকানন্দ এবং সেইদিনই তিনি জেনেছিলেন যে, তাঁর এই কন্যাটি নিজেকে ভারতের শুভকর্মে বহুধা বিকীর্ণ করে দিতে পারবেন। গুরুর এই ধারণা মিথ্যা হয়নি। গুরুর সঙ্গে ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে ছয়মাস ধরে তিনি এই মহান্ দেশের রূপৈশ্বর্য যতটুকু প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন তাতে করে নিবেদিতার মনে এই ধারণা দৃঢ় হয়েছিল যে, ভারতবর্ষের বেদীমূলে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরে নিজেকে তিনি সত্যই ধন্য মনে করেছেন। গুরুর কাছ থেকে ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের অনেক পরিচয় লাভ করার পর

তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন কোথায় এই দেশের মহত্ত্ব আর কোথায় বা এর শ্রেষ্ঠত্ব।

বোসপাড়া লেনে 'ভগিনী নিবাস' বাড়িখানি কিন্তু খুব আরামের ছিল না। যে-বাড়িতে নিবেদিতা বাস করতেন, ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে আর অস্বাস্থ্যকর হোলেও তাঁর কাছে খুব আরামপ্রদ এবং সুন্দর মনে হোতো। গরমের দিনে সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে বাড়িটা খুব গরম হোয়ে উঠতো। তবু হাসিমুখ—কোনো অনুযোগ নেই। এই যে তাঁর জীবন-সাধনা। মাঝে মাঝে বেলুড় মঠ থেকে এসে গুরু তাঁর শিষ্যাকে নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন। আর দিতেন উৎসাহ। স্কুলের উদ্বোধন দিবসে স্বয়ং শ্রীমা এই বলে আশীর্বাদ করেছিলেন ঃ "মহামায়ার শুভাশীষ এই বিদ্যামন্দিরের উপর শতধারে বর্ষিত হোক।" তাই হোয়েছিল। দিনে দিনে স্কুলটির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল।

নিবেদিতার শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল অভিনব। তিনি কখনো শিশু-মনের ওপর জোর করে কিছু চাপাবার চেষ্টা করতেন না। প্রত্যেকটি মেয়ের নিজের নিজের মনোবৃত্তি ও সংস্কার অনুমান করে খেলার ছলে তার অন্তরের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতেন তিনি। শিক্ষা দেওয়া হোতো কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি অনুযায়ী। পুতুল গড়া, সূঁচের কাজ, তেঁতুলের বীচি দিয়ে গোণা শেখা থেকে আরম্ভ করে পৌরাণিক উপাখ্যান শোনা - এইসব ছিল লেখাপড়ার বিষয়। সকল বর্ণের, সকল জাতির মেয়েরা পড়তো এখানে—তবে সবাই ছিল হিন্দু মেয়ে, কারণ স্কুলটি অবস্থিত ছিল একেবারে খাঁটি হিন্দু পল্লীতে। কখনো কখনো তিনি মেয়েদের পাথরে বা মাটিতে ছাঁচ-কাটা শেখাতেন। এ ছাড়া, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, রাজস্থানের কাহিনী, ব্যাকরণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ গল্পচ্ছলে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করতেন। কখনো তিনি ছাত্রীদের চিড়িয়াখানা ও যাদুঘর দেখিয়ে নিয়ে আসতেন। এমনি করেই নিবেদিতা তাঁর ছাত্রীদের স্বদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে

পরিচয় করিয়ে দিতেন। এর ফলে তারা দেশের প্রত্যেকটি জিনিসকে আদর ও শ্রদ্ধা করতে শিখেছিল। রবীন্দ্রনাথের বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্কুল প্রায় এই সময়ের কাছাকাছি আরম্ভ হয়ে ছেলেদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তর এনে দিয়েছিল। এই রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার একজন বড়ো অনুরাগী ছিলেন, সে কথা পরে বলব।

একদিন। দুপুরবেলা।

স্কুলে ক্লাস বসেছে। একটি ছোট মেয়ে তার শ্লেটে লাইন টানছিল। নিবেদিতা ছাত্রীটিকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি করছ?

—লাইন টানছি, সিষ্টার।

—লাইন!

কথাটি শোনামাত্র নিবেদিতা তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—লাইন বলছ কেন? তোমার নিজের ভাষায় বলো।

—কেন আমরা তো লাইন বলি।

—না, বাংলা করে বলো।

মেয়েটি বড়ো মুস্কিলে পড়লো। 'লাইন' কথাটি ইংরেজি (Line)। এর ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ যে কি তা ছোট মেয়েদের মধ্যে কেউ-ই তখন ভেবে পেল না। নিবেদিতা সকলকেই জিজ্ঞাসা করলেন। সবাই নিরুত্তর। তখন তিনি বললেন—তোমাদের মাতৃভাষায় এটা বলবার চেষ্টা করো। কেউ পারে না। দুঃখে, বিরক্তিতে নিবেদিতার মুখ লাল হোয়ে উঠলো। বললেন—কেন, তোমাদের নিজেদের ভাষায় এর কোনো শব্দ নেই? হঠাৎ একটি মেয়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো —রেখা। অমনি নিবেদিতা বলে উঠলেন—রেখা, রেখা। দ্যাখো দেখি কী সুন্দর তোমাদের নিজেদের কথা। আনন্দের সীমা নেই তাঁর। তিনি যেন একটি হারানো জিনিস খুজে পেলেন। বার বার উচ্চারণ করতে লাগলেন—রেখা, রেখা। এমনি করেই তিনি ছাত্রীদের শিক্ষা দিতেন আর সেই সঙ্গে নিজেও একটু একটু করে বাংলা শিখতেন।

ক্রমে স্কুলটি জমে উঠলো। ছোট ছোট মেয়ে থেকে আরম্ভ করে পল্লীর অনেক মহিলা—তাঁদের কেউ বধূ, কেউ বা গৃহিনী, কেউ সধবা, কেউ বিধবা—সকলেই এসে এই স্কুলের ছাত্রী হতে আরম্ভ করল। যে যেমন ভাবে শিক্ষালাভ করতে চাইতো নিবেদিতার স্কুলে ঠিক সেই রকম ব্যবস্থাই ছিল। ভাষা, গণিত, শিল্পকার্য, সেলাই এবং ছবি আঁকা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হোত। স্কুলের একখানা গাড়ি দরকার। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু নিবেদিতার স্কুলে একটি ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই গাড়ি করে তিনি ছাত্রীদের পালা করে সপ্তাহে একদিন যাদুঘর আবার কোনো সপ্তাহে চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যেতেন।

তখন স্কুলে শিক্ষয়িত্রী বলতে মাত্র তিনজন ছিলেন, নিবেদিতা, ভগিনী ক্রিষ্টিন আর সুধীরা বসু। ক্রিষ্টিন আমেরিকার মেয়ে। ১৮৯৪ সালে স্বামীজী যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ভারতের মেয়েদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবার সঙ্কল্প গুরুকে জানান। স্বামীজী মারা যাবার অল্পকাল আগে তিনি এই দেশে আসেন এবং নিবেদিতা স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হন। এই স্কুলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিবেদিতা, কিন্তু মায়ের মতন একে লালন-পালন করেছিলেন ভগিনী ক্রিষ্টিন। ১৯১১ সালে নিবেদিতা মারা গেলে পরে তিনিই এই বিদ্যালয় পরিচালনার সকল দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিলেন।

সুধীরা বসু ছিলেন তখনকার অন্যতম বিপ্লবী দেবব্রত বসুর বোন। ইনি ১৯০৬ সালে এই স্কুলের কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। নিবেদিতা খুব যত্নের সঙ্গে সুধীরাকে ইংরেজি শেখাতেন। বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে সুধীরা ক্রমশঃ ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিষ্টিনের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে নিবেদিতা তাঁকে স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত করেছিলেন। নিবেদিতাকে দিয়ে

একদিন যে শুভকার্যের উদ্বোধন হয়েছিল, পরবর্তীকালে সুধীরার নেতৃত্বে তা অনেকখানি প্রসারিত হয়। ক্রিষ্টিন ও সুধীরার ত্যাগ ও শ্রম নিবেদিতার প্রয়াসকে সফল করে তুলতে অনেকখানি সহায়তা করেছিল।

নিবেদিতার কাজ কিন্তু ঐ স্কুলের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। বাগবাজারের সেই সংকীর্ণ গলিটির মধ্যে বসেই তিনি সমগ্র বাংলার জীবনপ্রবাহের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন। এমন কি, এইখানে বসেই তিনি যেন বিরাট ভারতবর্ষের প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করতেন। তাই দেখা গেল যে অতি অল্পকালের মধ্যেই বোসপাড়ার ঐ সতর নম্বর বাড়িটি ভারতবর্ষ ও বাংলার তখনকার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করলো। বহু মনীষী ও দেশসেবক, কবি ও সাহিত্যিক, শিল্পী ও সম্পাদক, সমাজসেবক ও রাজনৈতিক নেতা—নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ঐ বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন। সমকালীন বাংলার নব জাগরণের শঙ্খধ্বনি এখানে বেজে উঠেছিল, আর উনিশ শতকের প্রথমভাগে বাংলায় যে বিরাট স্বদেশী আন্দোলন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বোমার আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের এই বাড়িতে তার অনেকখানি ইতিহাস রচিত হয়েছিল। গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বালগঙ্গাধর তিলক, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, যদুনাথ সরকার, শিশিরকুমার ঘোষ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, সরোজিনী নাইডু—এঁদের নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল এখানে এবং সকলের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিলেন নিবেদিতা। অনেক ইংরেজও আসতেন, এমন কি বড়লাট-পত্নী লেডি মিণ্টো পর্যন্ত এসেছিলেন একবার।

ক্রমে বোসপাড়ার বাড়িটি বিখ্যাত হয়ে উঠলো—আর সঙ্গে সঙ্গে নানা কর্মের প্রবাহ নিবেদিতার জীবনের তুইতট দিয়ে খরস্রোতে বয়ে যেতে লাগল। একদিকে চলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সমাজ সেবা, আর অন্যদিকে গোপনে চলে বিপ্লবের উদ্বোধন ও আয়োজন। এ এক বিচিত্র নারী যাঁর আবাস ছিল সেদিনের বাংলার বিপ্লবীদের আশ্রয় ও মন্ত্রণাগৃহ। অরবিন্দ ঘোষ থেকে আরম্ভ করে বাংলার সমস্ত বিপ্লবী শক্তিকে এই শক্তিময়ী নারী সেদিন প্রেরণা জুগিয়েছিলেন এইখানে বসে। সে এক অসাধ্যসাধন। এক অঙ্গে এত রূপ আর এক হৃদয়ে এত উদ্দাস জল্পনা-কল্পনা এর আগে কেউ বড়ো একটা প্রত্যক্ষ করেনি। এখানে বসেই একা নিবেদিতা সেদিন একশো নিবেদিতারূপে বহু ও বিচিত্র কর্মপ্রবাহের সৃষ্টি করেছিলেন। নিজেকে তিনি নিয়োজিত করেছিলেন বিভিন্ন দিকে বাংলাকে জাগিয়ে তুলতে। সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, জাতীয় শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, সাংবাদিকতা, গ্রন্থরচনা আবার রাজনৈতিক কাজ—কোন্‌টি নয়? আগেই বলেছি, তিনি যেখানে থাকতেন তার পরিবেশ মনোমুগ্ধকর হওয়া তো দূরের কথা, তা ছিল যেমন অস্বাস্থ্যকর তেমনি অসুবিধাজনক। কতবার কত লোক বলেছে, এই এঁদোপরা গলিতে পড়ে আছেন কেন? আপনাকে এখানে মানায় না, শহরে আরো কত ভালো জায়গা আছে থাকবার।

নিবেদিতা শুনতেন আর হাসতেন। বলতেন—"গুরু আমাকে এখানে স্থাপন করে গেছেন, প্রাসাদের প্রলোভনেও আমি এ স্থান ত্যাগ করে কোথাও যাব না।" আরো একটি সুন্দর কথা তিনি বলতেন—"এই গলি আমাকে মানুষ করেছে, আমি কি একে ছেড়ে অন্য কোথায় গিয়ে থাকতে পারি?" এই দেশের প্রতি, এই দেশের লোকদের প্রতি তাঁর মমতা যে কতখানি আন্তরিক, কতখানি সত্য ছিল, তা নিবেদিতার এই একটিমাত্র কথা থেকেই জানা যায়।

স্কুল স্থাপিত হবার পর থেকে নিবেদিতা কলিকাতাতেই বাস করতে থাকেন। এই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে এসে শিষ্যার কাজকর্ম দেখে যেতেন, কি সুবিধা বা অসুবিধা হচ্ছে তার খোঁজ-খবর নিতেন এবং তাঁর কাজে উৎসাহ দিতেন। বেলুড় থেকে স্বামীজী যখন কলিকাতায় আসতেন, তখন তিনি উঠতেন বলরাম বসুর বাড়িতে। এটা নিবেদিতার জানা ছিল এবং তাঁর ওপর আদেশ ছিল যে সন্ধ্যায় গিয়ে তিনি স্বামীজীকে একবার প্রণাম করে আসবেন। একদিন হোল কি, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার অনেকক্ষণ পরেও নিবেদিতার দেখা নেই। স্বামীজী উদ্বিগ্ন হোলেন। বার বার জিজ্ঞাসা করছেন, নিবেদিতা এখনো এলো না কেন? প্রায় একঘণ্টা বাদে নিবেদিতা এসে নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন। স্বামীজী শুধু কঠোর গম্ভীর স্বরে ডাকলেন—নিবেদিতা। নিবেদিতার মুখে কথা নেই, তিনি শুধু হাত জোড় করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—তোমার আজ আসতে এত দেরী হোল কেন?

—একজন ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে বিকেলবেলায় চৌরঙ্গীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম; নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে দেরী হয়ে গেল। ফিরেই আপনার কাছে চলে এলাম।

—তুমি এখন ব্রহ্মচারিণী, সন্ধ্যার পর কোনো পুরুষের সঙ্গে বেড়ানো, এমন কি আলাপ পর্যন্ত করা ঠিক নয়। সন্ধ্যায় জপধ্যান করার সময়, আমি থাকলে শুধু প্রণাম করতে আসতে পারো, তার বেশি নয়। রাতের বেলাও এখানে আসা ঠিক নয়।

—ভবিষ্যতে আর কখনো এমন হবে না।

তখন বিবেকানন্দ অনুতপ্তা শিষ্যার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাইলেন এবং দু-একটি কথার পর কন্যাকে বিদায় দিলেন। এমনি কঠিন দৃষ্টি রাখতেন তিনি শিষ্যার ওপর। স্নেহে ও শাসনে তাঁর প্রকৃতি এইরকম ছিল, এইভাবেই তিনি নিবেদিতাকে গড়ে তুলেছিলেন।

১৮৯৯, জুন মাস। বিবেকানন্দ আবার পৃথিবী ভ্রমণে বেরুলেন। সঙ্গে চললেন নিবেদিতা আর স্বামী তুরীয়ানন্দ। বিলেতে গিয়ে তাঁর স্কুলের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করা যায় কিনা, সেই উদ্দেশ্যে নিবেদিতা গুরুর সঙ্গে চলেছেন। সমুদ্র পাড়ি দেবার সময় স্বামীজী অবসর সময়ে আগের মতন শিষ্যাকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। একদিন কথায় কথায় ঈশোপনিষদের প্রসঙ্গ উঠলো। স্বামীজী বললেন—অপূর্ব এই গ্রন্থ। পৃথিবীর অধ্যাত্ম সাহিত্যে এর জুড়ি নেই। মাত্র আঠারোটি কবিতা। কিন্তু বিষয়বস্তু গৌরবে এ-গ্রন্থ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শন-গ্রন্থ বলে যুগে যুগে সমাদৃত।

—ঈশোপনিষদের সার কথা কি? প্রশ্ন করেন নিবেদিতা।

—এর বক্তব্য চারটি। ব্রহ্মজ্ঞান ও তার ফল; জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়; সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ ও মৃত্যুকালীন চিন্তা এবং অগ্নিস্তুতি। এর একটা শ্লোক বলি, শোনো। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্*—পৃথিবীর কোন্ ধর্মগ্রন্থ এমন উচ্চভাবের কথা বলতে পেরেছে?

মুগ্ধ বিস্ময়ে নিবেদিতা শুনলেন এই মহাবাণী আর ভাবলেন কী আশ্চর্য এই অনুভূতি—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং···

আর একদিন। জাহাজ তখন জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করেছে। নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করলেন—জীবনে শ্রেষ্ঠ সাধনা কি?

—মনুষ্যত্বলাভ।

গুরুর মুখে এই উত্তরটি শোনার পর নিবেদিতার মনে হোলো, জীবনের উদয়াচলে তিনি যেন এক *নতুন চেতনার সূর্যোদয়কে প্রত্যক্ষ করলেন আজ।*

---

* অর্থাৎ, ঈশ্বরদ্বারা সমুদয় জগৎ আচ্ছাদন কর, তিনি যা দান করেছেন তাই-ই উপভোগ কর, আর সব কিছু ত্যাগ করে কেবল তাঁকে নিয়ে থাক।

দেখতে দেখতে কালচক্রের আবর্তনে সমারোহপূর্ণ উনবিংশ শতাব্দী শেষ হোলো।

ইতিহাসের কক্ষপথে আরম্ভ হয় আরেকটি নতুন শতাব্দীর।

এই বিংশ শতাব্দীকে মাত্র স্পর্শ করে স্বামী বিবেকানন্দ ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। ১৯০২, ৪ঠা জুলাই বেলুড় মঠে সেই বিশ্ব-বরেণ্য সন্ন্যাসীর মৃত্যু হোলো। এই ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষেই নিবেদিতা লণ্ডন থেকে রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে এক জাহাজে চড়ে কলিকাতায় এসে পেঁছিলেন। স্বামীজী তার কিছু আগেই স্বদেশে ফিরে আসেন। তখন থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য অবনতির পথে। একটা দাবানল বুকে নিয়ে পরিব্রাজকরূপে তিনি আসমুদ্র-হিমাচল এই ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন এবং অর্ধ পৃথিবী ঘুরে আসেন। জীবনের শেষ পাঁচ-ছয় বৎসরে তিনি যেন একটা দৈত্যের মতন কাজ করতেন। ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসেই তিনি পীড়িত হোলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিবেকানন্দকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়েছিলেন। এ কথা অন্তরঙ্গদের মধ্যে কেউ কেউ জানতেন। তাই এপ্রিল মাসে স্বামীজীকে গুরুতরভাবে অসুস্থ দেখে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আশঙ্কা করলেন, এইবার বুঝি তিনি লীলা সম্বরণ করবেন।

জুন মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন বিবেকানন্দ দু'জন শিষ্যকে সঙ্গে

নিয়ে বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়িতে এলেন। আচার্যদেবকে সম্বর্ধনা জানালেন শিষ্যা 'জয় গুরু' বলে। তারপর তিনি ধীরে ধীরে দোতলায় উঠে এসে এক খণ্ড মৃগজীনে বসলেন। গুরুর পাদস্পর্শ করে নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করেন, "এখন কেমন আছেন ?"

—ভালো নেই, যমের ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছি।

—কাশীতেই ভালো ছিলেন দেখছি।

—কাশী শিবপুরী। পৃথিবীতে অমন তীর্থস্থান আর দুটি নেই।

নিবেদিতা চুপ করে বসে আছেন যুক্তকরে। আচার্যের শরীরের অবস্থার দিকে তাকিয়ে তাঁর অন্তরে উদ্বেলিত হয় বেদনা। সেই আগ্নেয়গিরি আজ যেন স্তিমিত। স্বামীজী প্রশান্ত স্বরে বলেন, "আত্মা অবিনশ্বর, শরীর তো ক্ষয়শীল, গীতায় এ কথা পড়েছ।"

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। পলকহীন দৃষ্টি সন্ন্যাসীর চক্ষে, ঠোঁটে নির্মল স্নিগ্ধ হাসির বঙ্কিম রেখা। কন্যার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ কথা বললেন তিনি। স্কুলের জন্যে একটা নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, তারই টাকা সংগ্রহ করতে নিবেদিতা বিলেত গিয়েছিলেন।

—নতুন বাড়িতে স্কুল প্রতিষ্ঠার সময়ে আপনি কি এসে আশীর্বাদ করবেন ?

—আমার আশীর্বাদ তো সব সময়ই তোমাকে ঘিরে রয়েছে। ঠাকুরের পায়ে, আমার ইষ্টদেবী ভারতমাতার চরণে তোমাকে পুষ্পাঞ্জলি হিসেবে নিবেদন করেছি। তোমার জীবনব্রত সার্থক হোক।

এই বলে কন্যার মাথায় হাত রেখে স্বামীজী উঠলেন। যাবার বেলায় বললেন, "কাল সকালে তুমি একবার বেলুড়ে এসো। সেখানে সকলের সামনে স্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করব।"

এরপর মৃত্যুর ঠিক সাতদিন আগে বিবেকানন্দ শেষবারের মতন এলেন বাগবাজারে। বললেন, 'আমি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। একটা মহাতপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমার মধ্যে জেগেছে "

এমন কথা তো নিবেদিতা গুরুর মুখে কখনো শোনেন নি। তবে কি মহাপ্রস্থান আসন্ন ?

৩রা জুলাই, ১৯০২। নিবেদিতা বেলুড় মঠে এলেন অসুস্থ আচার্যদেবকে দেখতে। সেই দিনটি তাঁর জীবনে চিরস্মরণীয় হোয়ে রইল। সেদিন স্বামীজী নিজের হাতে নিবেদিতাকে খাদ্য পরিবেশন করলেন এবং খাওয়া শেষ হোলে নিজে তাঁর হাতে জল ঢেলে দিলেন। চকিতে নিবেদিতার মনে পড়লো, মৃত্যুর পূর্বে যীশুখৃষ্ট তাঁর এক শিষ্যের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। পরে স্বামীজী ধীরে ধীরে মন্ত্রোচ্চারণ করে কন্যার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন আর বললেন—"Be loyal to your mission my child."—"সংকল্পে নিষ্ঠা রেখ, বৎস"—ইহজীবনে নিবেদিতাকে সেই তাঁর শেষ কথা।

নিবেদিতা ফিরে এলেন বাগবাজারে। মন তাঁর ভারাক্রান্ত। সেই রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি। স্বপ্ন নয়; দুঃস্বপ্ন। সেই দুঃস্বপ্নে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়! ভোর হয়েছে। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। কে যেন বাইরে দরজায় কড়া নাড়ছে। ত্রস্তপদে নীচে এসে দেখেন বেলুড় থেকে একজন তরুণ ব্রহ্মচারী এসেছেন একটি চিঠি নিয়ে। চিঠি লিখেছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তাতে লেখা—"স্বামীজী আর নেই। ৪ঠা জুলাই, শুক্রবার, রাত নটায় সময়ে আমাদের নেতা স্বামী বিবেকানন্দ মহাপ্রস্থান করেছেন।" দারুণ দুঃসংবাদ। নিবেদিতার মনে হোল—তাঁর পৃথিবী আজ অন্ধকার। ব্রহ্মচারীকে বললেন, "একটু অপেক্ষা কর।" ঘরে ফিরে এলেন তিনি। কম্পিতহস্তে টেবিল থেকে তুলে নিলেন ডায়েরিখানা। ৪ঠা জুলাইয়ের পাতায় লিখলেন শুধু দুটি কথা—"Swami died.।" নিদারুণ শোকে এর বেশি কিছু কথা তিনি আর লিখতে পারলেন না। তারপর সেই পত্রবাহকের সঙ্গেই তিনি ছুটে এলেন বেলুড়ে।

পুষ্পাবৃত সমাধিলীন সেই সুন্দর শিবমূর্তির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি। মনে পড়লো গুরুর আশ্বাসবাণী—"আমি মৃত্যু পর্যন্ত তোমার পিছনে থাকব।" তারপর বেলুড়ে গঙ্গার তীরে জ্বলে উঠলো চিতা। একাধারে শঙ্করের প্রতিভা আর বুদ্ধের হৃদয় নিয়ে যে মহাপ্রাণ এসেছিলেন এই পৃথিবীতে এবং যিনি অদ্বৈত-বেদান্তের উদার বাণী প্রচার করে তাঁর স্বজাতির প্রাণে জাগিয়ে দিয়েছেন এক নতুন চেতনা, নিবেদিতা দেখলেন, মুহূর্ত মধ্যে লেলিহান অগ্নিতে সেই আধারটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গঙ্গার তীরে সেই পবিত্র চিতার শিখা আকাশ ছুঁয়ে কাঁপছে। সেদিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে শ্মশানের ধূলায় বসে আছেন নিবেদিতা। চোখের সামনে এক মহৎ সর্বনাশকে প্রত্যক্ষ করছেন তিনি। যে জীবন আজ অর্ধ পথে বিদায় নিলো, সে কি আর একজনের হাতে তার অসমাপ্ত কর্মভার সঁপে গেলো? সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে শ্মশানে। হঠাৎ চমকে মাটির দিকে তাকিয়ে দেখেন নিবেদিতা, চিতার আগুন থেকে স্বামীজীর গৈরিকবাসের এক টুকরো কেমন করে হাওয়ায় ছিটকে এসে তাঁর সামনে পড়ে আছে। ধূলো থেকে সে অমূল্য সম্পদ তিনি দু'হাতে আকুল হয়ে তুলে নিলেন—ধারণ করলেন মাথায়। অনুভব করলেন যেন গুরুর পূতস্পর্শ। তিনি আর শোকাভিভূতা হলেন না। সত্য, তাঁর মন আজ শূন্য, কিন্তু নিবেদিতা অনুভব করলেন—গুরু তাঁকে দিয়ে গেছেন একটি কাজের ভার। তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে সেই কাজ করতে হবে।

কর্মক্লান্ত সন্ন্যাসী তাঁর অসমাপ্ত কাজের গুরুভার তাঁর মানসকন্যার হাতে তুলে দিয়ে ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। নিবেদিতার জগৎ আজ শূন্য, কিন্তু তাঁর অন্তর ভরে আছে গুরুর অগ্নিময় বাণীতে। সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে সতর নম্বর বোসপাড়া লেন যখন নির্জন ও

নিস্তব্ধ হয়ে আসে, তখন গুরুর ছবিখানির সামনে বসে থাকেন নিবেদিতা—যেন ধ্যানমগ্না তপস্বিনী। মানসপটে ভেসে আসে একে একে অতীতের দিনগুলি, হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হয় তাঁরই অগ্নিক্ষরা উপদেশ। গুরু বলতেন, "চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্ম-নির্ভরতা, সেই অটল ধৈর্য, সেই একতাবন্ধন আর সেই উন্নতিতৃষ্ণা। চাই—সর্বদা পশ্চাতদৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ প্রসারিত দৃষ্টি ঃ আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ। আজ যেন আমরা প্রার্থনা করিতে পারি—হে ওজঃস্বরূপ ! আমাদিগকে ওজস্বী কর ; হে বীর্যস্বরূপ ! আমাদিগকে বীর্যবান কর ; হে বলস্বরূপ আমাদিগকে বলবান কর।"

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি—জ্ঞানে, প্রেমে, পৌরুষে এবং কর্মে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন একটি প্রতিভার আবির্ভাব এর আগে হয়নি, মনে মনে ভাবেন নিবেদিতা। তাঁরই ধ্যানে, তাঁরই কর্মে জন্ম নেবে নতুন ভারতবর্ষ—ইতিহাসের অন্ধকার পথে বিবেকানন্দ যেন একটি আলোকবর্তিকা স্বরূপ। দেশের কল্যাণে এবং জগতের কল্যাণে এমন আত্মোৎসর্গ কে দেখেছে ? সেই প্রথম দিনের পরিচয় থেকে তাঁর মহানির্বাণ পর্যন্ত—এই অল্প কয়েক বৎসর গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে নিবেদিতা বিবেকানন্দকে যতটুকু বুঝেছিলেন, যতটুকু জেনেছিলেন তারই আলোকে তিনি গুরুর স্বল্পায়ু জীবনের কর্ম ও চিন্তাধারা বারম্বার আলোচনা করেন একান্ত মনে। কি ছিলেন তিনি ? বিশ্বজয়ী ধর্ম প্রচারক। হিন্দু-সভ্যতার বার্তা তিনি শুনিয়েছেন পাশ্চাত্য জগৎকে, বেদান্তের ভেরী-নির্ঘোষে তাঁর স্বদেশবাসীর বহির্মুখী মন তিনি অন্তর্মুখী করেছেন, আর স্বজাতির মধ্যে প্রচার করেছেন কর্মযোগ ও সেবাধর্মের মহিমা। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে এই তো সব কথা নয়, ভাবেন নিবেদিতা। তাঁর স্বদেশবাসীকে আজ বোঝাতে হবে যে, স্বামীজীর জীবনের আরো একটা দিক আছে যেটা

এখনো কেউ ঠিক মতো উপলব্ধি করতে পারে নি। গুরুর ছবিখানির সামনে অপলক দৃষ্টিতে আবার চাইলেন নিবেদিতা। তুমি কী শুধু সন্ন্যাসী ছিলে? না, আমি দেখেছি তুমি ছিলে স্বাধীনতার উপাসক, একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক। আমি যে দেখেছি কী তীব্র স্বদেশপ্রেম ছিল তোমার মধ্যে। গৈরিকের আবরণে তুমি যে অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরি। পারলৌকিক মোক্ষমার্গের মহিমা প্রচার করার জন্য তোমার তো আবির্ভাব নয়, তুমি যে জন্মবিপ্লবী। রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে নতুন কোনো ধর্মসম্প্রদায় সৃষ্টি করবার অভিপ্রায় তো তোমার ছিল না। আমি যে দেখেছি দেশপ্রেমের দাবানল বুকে নিয়ে তুমি সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছ। সেই তোমার উদাত্ত বাণী—"এসো, মানুষ হও···এগিয়ে যাও, সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়—" এই তো তোমার মনের কথা। এই আহ্বানই তো তুমি রেখে গিয়েছ তোমার জাতির জন্যে। প্রভু, তুমি আমাকে শক্তি দাও, যাতে তোমার এই আহ্বানকে আমি দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে পারি, যাতে তোমার এই বিরাট আহ্বানে ঘুমন্ত জাতি সাড়া দেবে আর কঙ্কালে জাগবে প্রাণের লক্ষণ। আজ থেকে এই আমার ব্রত। এই বলে নিবেদিতা ছবির সামনে প্রণতা হলেন। তাঁর সমস্ত সত্তা যেন এক নতুন স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে উঠে।

জুলাই মাসে বিবেকানন্দ মারা গেলেন।

গুরুর মৃত্যুর পর তাঁর ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে নিবেদিতা গুরুপূজা করে বৃথা সময় কাটান নি। তিনি ভারত ভ্রমণে বেরুলেন। উদ্দেশ্য—বিবেকানন্দকে প্রচার করা। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে যে বিপ্লবী বিবেকানন্দ ছিল তারই আগ্নেয়রূপ তিনি বাঙালীর সামনে, ভারতবাসীর সামনে এইবার তুলে ধরতে চাইলেন। কলিকাতার এক

জনসভায় নিবেদিতা যখন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন : "স্বামীজীই আমার ধর্ম, আমার দেশহিতৈষণা সব—তিনি আমাদের মহান্ জাতীয় নেতা" তখন সবাই বুঝলেন নিবেদিতার জীবনের গতি এবার কোন্ পথে রূপ নেবে। তারপর স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারের জন্যে তিনি প্রথমে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা করলেন বিবেকানন্দ সোসাইটি ; উদ্দেশ্য : বিবেকানন্দকে ঠিকমত বুঝবার এবং বোঝাবার চেষ্টা করা। এই কাজটিকে ব্যাপক করে তোলার জন্য অক্টোবরের প্রথমেই নিবেদিতা ভারত ভ্রমণে বেরুলেন। সখের ভ্রমণ নয়। দেশবিখ্যাত নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ছিল এই ভ্রমণের আরেকটা উদ্দেশ্য। পুণায় তিলক, বরোদায় অরবিন্দ প্রভৃতির সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এই সময়ে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের যখন যে শহরে গিয়েছেন, সেখানে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়েছেন ; সে সব বক্তৃতার বিষয় ছিল : পরাধীনতার জ্বালা আর স্বাধীনতা স্পৃহা জাগিয়ে তোলার আহ্বান, বেদান্তের মোক্ষ নয়। কন্যার কণ্ঠকে আশ্রয় করে যেন বিবেকানন্দ স্বয়ং কথা বলছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন এবং মঠ এর প্রতিষ্ঠাতার স্বদেশপ্রেমকে স্বীকার করেনি, তাঁরা ভিন্ন পথে চলতে চাইলেন। নিবেদিতা বিস্মিত এবং কিছুটা বিচলিতও হলেন। ভারতের মর্মবাণী যাঁর কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলতো, যাঁর জীবনদর্শন জীবনের নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করে গিয়েছে, সেই বীর্যবান স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীর জীবনের স্বপ্ন যাতে একেবারে শূন্যে বিলীন না হয়ে যায়, সেই উদ্দেশ্যে তাঁর মানসকন্যার এই প্রচার-অভিযানকে মঠের কর্তৃপক্ষেরা ভুল বুঝলেন। নিবেদিতার সঙ্গে হোলো আবার মতান্তর ; মতান্তর থেকে বিচ্ছেদ। রামকৃষ্ণ মিশনে নিবেদিতার স্থান হোলো না। মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন নিবেদিতাকে ডেকে বললেন : "হয় আপনি রাজনীতি ত্যাগ করুন, নয় মিশনকে ত্যাগ করুন। এ দুটোর একটা আপনাকে বেছে নিতে হবে।"

—আমি তো রাজনীতি করছি না, গুরুর জীবনী ও বাণীর প্রচারকেই আমি আমার জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছি। একে যদি আপনারা রাজনীতি মনে করেন, তবে শুনুন আমি রাজনীতি ত্যাগ করব না।

এই কথা কয়টির ভেতর দিয়ে নিবেদিতা-চরিত্রের যে রূপটি ফুটে উঠলো তা যেন একখানি কোষমুক্ত তরবারি। মিশন তাঁকে ত্যাগ করলেন বটে, ভারতমাতা কিন্তু তাঁর এই সেবিকাকে বুকে টেনে নিলেন। স্কুলটি পরিচালনার সকল দায় ও দায়িত্ব অবশ্য তাঁরই রইলো।

একে একে লাহোর, বোম্বাই, পুণা, গুজরাট, আমেদাবাদ, নাগপুর, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে প্রায় দু'মাসকাল নিবেদিতা ভ্রমণ করলেন এবং অক্লান্তভাবে বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতার বিষয় একই : বিবেকানন্দ ও তাঁর স্বদেশপ্রেম। এই সময়েই নিবেদিতা বরোদায় অরবিন্দ ঘোষ এবং পুণায় বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। নিবেদিতা জানতেন, বয়োজ্যেষ্ঠ তিলক স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এই ভাবে দেশ-দেশান্তরে বিবেকানন্দের সংগ্রামী আদর্শ প্রচার করে নিবেদিতা ভারতের জনসাধারণের হৃদয় জয় করলেন। কত স্থানে যে ভাষণ দিলেন তার সংখ্যা নেই। ছাত্ররা এসে জিজ্ঞাসা করে—আমরা কি করব? নিবেদিতা উত্তর দেন, যেভাবে পারো, মুক্ত মন নিয়ে ভারতবর্ষের সেবা কর। নাগপুরে মরিস কলেজে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি একটি উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেছিলেন।

উত্তর-ভারত ভ্রমণ করে নিবেদিতা এলেন বরোদায়। এইখানে সাক্ষাৎভাবে আলাপ হোলো অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে। দূর থেকে তাঁর নাম শুনেছেন এবং লেখা পড়েছেন। অরবিন্দ ও নিবেদিতা, এই দুই মহাবিপ্লবী যেদিন বরোদায় পরস্পর মিলিত হলেন, বাংলার

ইতিহাসে সেইদিনই একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। নিবেদিতার কথাও অরবিন্দের কানে গিয়ে পোঁছেছে। লোকমুখে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের এই মানসকন্যাটির সম্পর্কে যেসব কথা শুনেছিলেন, তাতে করে তিনি সহজেই এই বিদেশিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তুজনেই ছিলেন জন্ম-বিপ্লবী, ত্নজনের চিন্তাধারা একই খাতে প্রবাহিত ছিল। দূর থেকেই নিবেদিতা অরবিন্দের নীরব নিঃশব্দ দেশপ্রেমের পরিচয় পেয়ে বুঝেছিলেন যে, আগামী দিনের বাংলাকে অগ্নিমন্ত্রে ইনিই দীক্ষা দেবেন।

তুজনে সাক্ষাৎ হোলো। নিবেদিতার তুই চোখ যেন দশ চোখ হয়ে অরবিন্দকে দেখতে লাগল। স্বল্পভাষী, শান্তপ্রকৃতি ও কৃশতনু এই মানুষটি যে একটি প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরি, সে কথা বুঝতে তাঁর দেরী হোলো না। ভারত-আত্মার এক জীবন্ত বিগ্রহকে নিবেদিতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর গুরুর মধ্যে, আজ আবার তাঁরই বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে এখন দাঁড়িয়েছেন ভারত-আত্মার আর একটি নবীন বিগ্রহ। প্রথম আলাপেই নিবেদিতা বলেন—বরোদায় আর কতকাল কাটাবেন? বাংলাদেশ আপনাকে চায়। বাংলাই আপনার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

—তা জানি। তবে আমার কাজ মানুষ তৈরি করা।

—কিন্তু বিপ্লবের তূর্যধ্বনি যে শোনা গেছে। কলিকাতায় এর সূচনা দেখে এসেছি। এখন দরকার নেতার। গুরুর নামে শপথ করছি, আপনার পাশে আমি দাঁড়াব।

—শপথের প্রয়োজন নেই। স্বামীজীর মানসকন্যা আপনি—এই যে অগ্নিশিখা তিনি রেখে গিয়েছেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি এই শিখা মশাল হোয়ে জ্বলে উঠবে একদিন।

তারপর তুজনে মিলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, এখন তাঁরা তুজনে—অরবিন্দ আর নিবেদিতা—ভারতবর্ষকে ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য একসঙ্গে কাজ করবেন, একসঙ্গে চিন্তা করবেন।

অতঃপর বেলুড় মঠের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিবেদিতা তাঁর গুরুর নির্দিষ্ট কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর সমস্ত সত্তা এখন থেকে যেন এক নতুন স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে উঠল। বাংলার হৃদয় থেকে যেন বেরিয়ে এলেন শক্তিময়ী এক নারী। বাংলার কবি সেই নারীকে স্বাগত জানালেন 'লোকমাতা' বলে।

উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ করে নিবেদিতা কলিকাতায় ফিরলেন। ১৯০৩ সালের এপ্রিল মাসে নতুন বাড়িতে তাঁর স্কুলটি স্থানান্তরিত হোলো।

নিবেদিতার স্কুলটি ক্রমশই জনপ্রিয়তা লাভ করছিল। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ছোট বোন লাবণ্যপ্রভা বসু তাঁর অগ্রজের নির্দেশে নিবেদিতার স্কুলে বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতে আরম্ভ করেছেন। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আসা-যাওয়ার জন্য আচার্য বসু নিজে একখানি ঘোড়ার গাড়ি কিনে দিয়েছেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে স্বামীজীর জীবিতকালেই নিবেদিতা বাংলার যে কয়জন মনীষীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বামীজীর মৃত্যুর পর এই পরিচয় খুব নিবিড় হয়। আরো অনেকেই ইতিমধ্যে কিছু অর্থসাহায্য করেছেন; আমেরিকা ও ইংলণ্ড থেকেও কিছু টাকা এসেছে। আগের চেয়ে ছাত্রী সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরস্ত্রী ও বিধবাদের জন্য একটি গীতা ক্লাস খোলা হয়েছে। যোগীন-মা তাদের গীতা পড়ান। পরমহংসদেবের বিশেষ অনুগৃহীতা ছিলেন ইনি। সেলাইয়ের ক্লাসও আরম্ভ হয়েছে। মোট কথা, স্কুলটি বেশ জমে উঠেছে। পল্লীর সকলেই এখন এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। নতুন স্কুল-বাড়ির প্রবেশ-পথে বাইরের দেয়ালে কাঠের একটি বোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা হয়েছে: "ভগিনী-নিবাস। নারী-সমিতি পাঠশালা—গ্রন্থাগার।"

মাঝে মাঝে স্কুলের প্রাঙ্গণে কথকতা হোতো। নিবেদিতা বাড়ি-বাড়ি ঘুরে সকলকে নিমন্ত্রণ করতেন। সেই সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতো না কেউ। আসতেন সবাই। বিকেলবেলা ঘেরা-টোপ গাড়িতে করে অনেক পুরস্ত্রী আসতেন, উঠানের পাশে সবুজ রঙের চিকের আড়ালে বসতেন তাঁরা। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বসত উঠানের মাঝখানে। একটি উঁচু বেদীর উপর বসতেন কথকঠাকুর। পুরাণের কাহিনী শোনাতেন সুমধুর স্বরে। কোনো কোনো দিন রামায়ণ-মহাভারতের কথাও বলতেন তিনি। সবাই শুনতো এক মনে। নিবেদিতাও শুনতেন।

প্রথম প্রথম কত বাধা-বিঘ্ন ছিল; মেমের স্কুল বলে কেউ মেয়ে পাঠাতে চাইত না। কিন্তু এখন ভগিনী-নিবাসে আসতে আর কারো সঙ্কোচ বোধ হয় না। এখন সবাই বিশ্বাস করে ছেলে-মেয়ে পাঠান। পল্লীর সকলেই এখন এই বিদেশিনীকে তাঁদেরই একজন মনে করে নিয়েছেন। হিন্দুর আচার-নিষ্ঠা, পাল-পার্বণ এবং ধর্মবোধ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে ছাত্রীদের শিক্ষা দিতেন তিনি খাঁটি জিনিস। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতেন আত্মবিশ্বাসের ইচ্ছা। এইভাবেই বাগবাজারের রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের হৃদয় জয় করলেন নিবেদিতা। হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল চমৎকার। গানের সঙ্গে সেলাই শিক্ষা; মুখে গান, হাতে ছুচ-সুতা। দেয়ালের গায়ে বিলম্বিত ভারতের একটি মানচিত্র। মানচিত্রটি দেখে ছাত্রীদের কল্পনা পাখা মেলে। শিক্ষার আসরে প্রার্থনা আর 'ভারতমন্ত্র' জপ—অদ্ভুত ব্যবস্থা। গুরু বলে গেছেন: "আমাদের দেশের মেয়েরা আজ ভীরু হয়ে গেছে, এদের সিংহিনীর মতো তেজী করে তুলতে হবে।"

গুরুর এই আদর্শকে সম্মুখে রেখে-ই নিবেদিতা ছাত্রীদের গড়ে তুলবার চেষ্টা করতেন। তাঁর সে-চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছিল। নিবেদিতা

স্কুলের অনেক মেয়ে পরবর্তীকালে জীবনের নানা ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু স্কুল চালাতে গিয়ে নিবেদিতাকে কম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। কত সময়ে স্কুলের তহবিল ফুরিয়ে আসে। স্কুলের উন্নতির জন্য আরো টাকা দরকার। কিছু টাকা আসে আমেরিকার বান্ধবীদের কাছ থেকে ; লণ্ডন থেকেও আসে। কিন্তু এতেও কুলোত না। বাইরের লোকের কাছ থেকে বেশি সাহায্য নিতে গুরুর নিষেধ ছিল। নিবেদিতা তাই নিজের দায় নিজেই বহন করতেন। এখন থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা আর বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে যা কিছু উপায় করতেন তা ব্যয়িত হোতো স্কুলের কাজে। এর জন্যে তাঁর পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। সারাটা দিনই দেখা যেত ভগিনী-নিবাসের রুদ্ধ ঘরে বসে নিবেদিতা লেখাপড়ার কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। এমন দিনও গিয়েছে যখন তাঁর ও সিষ্টার ক্রিষ্টিনের আহার্য জুটেছে সামান্য রকমের—হয়তো দুইখণ্ড পাউরুটি আর দুটি কলা—তাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করে হাসি মুখে স্কুল চালিয়েছেন নিবেদিতা।

এমনি করেই তিনি বাগবাজারের একটি ক্ষুদ্র গলির নিকটে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সত্যই সতর নম্বর বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা অতি সামান্যভাবেই বাস করতেন। গরমের দিনে পাখার অভাবে কষ্ট হোতো—কিন্তু সেই অসুবিধা তাঁকে এতটুকু টলাতে পারত না। মাঝে মাঝে বাক্স থেকে স্বামীজীর দু' একখানা পুরানো চিঠি বের করে তিনি পড়তেন। পড়ে বল পেতেন, প্রেরণা পেতেন, উৎসাহ বোধ করতেন। ১৯০২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখের এক চিঠিতে কাশী থেকে বিবেকানন্দ তাঁর কন্যাকে লিখছেন ঃ "তোমার মধ্যে সকল শক্তি সংহত হোক। জগজ্জননী মা তোমার হাত ও মনকে চালনা করুন। রামকৃষ্ণের মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে এই

কর্মক্ষেত্রে পরিচালনা করবেন; যেমন তিনি আমাকে একদিন করেছিলেন,—তার চেয়ে হাজার গুণে বেশি করবেন, জেনো।" ১৫ই ফেব্রুয়ারির আর একখানি চিঠিতে আশ্বাস দিয়ে লিখছেন ঃ "টাকার জন্যে কিছু ভেবো না; তোমার স্কুলের জন্য টাকা আপনি জুটে যাবে—নিশ্চয়ই।"

ওয়া গুরুজীকি ফতে! গুরুর জয় হোক!

নিবেদিতার কণ্ঠে উঠত এই বাণী। প্রতিকূল পরিবেশের সহস্র রকমের অসুবিধা মুহূর্তমধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে যেত। অসীম উৎসাহ বোধ করতেন তিনি মনের মধ্যে। গুরু তাঁকে এই ব্রত দিয়ে গেছেন। এই নিরাসক্ত বৈরাগ্যের ব্রত নিয়েই তো তিনি এসেছেন ভারতবর্ষে। এই ভারতের বেদীমূলে তিনি যে সমর্পিতা। বাগবাজারের ছোট্ট গলিতে একটি জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় গৃহের মধ্যে বসে সেদিন বিবেকানন্দের অভীপ্সিত কাজকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন নিবেদিতা। তাঁর সেই প্রয়াস তপস্যারই সমতুল্য। সেই তপস্যার ইতিহাসই নিবেদিতার জীবনের প্রকৃত ইতিহাস।
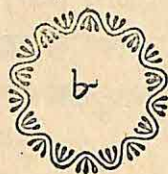
ভারতবর্ষে আসবার অল্পকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নব্য বাংলার প্রতিভাবান কবি। বিবেকানন্দ নিজে একদিন জোড়াসাঁকোয় নিবেদিতাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায় ছিলেন না, শিলাইদহের কুঠি বাড়িতে ছিলেন। সেইদিন থেকে জোড়াসাঁকোর এই সংস্কৃতিকেন্দ্রটি নিবেদিতাকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। ক্রমে তিনি ঠাকুরবাড়ির একজন শ্রদ্ধেয় অতিথি হয়ে উঠলেন। এখানে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁর প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ। দ্বিতীয় আকর্ষণের পাত্র ছিলেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিলাইদহ থেকে ফিরবার পর কবির সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়! প্রথম পরিচয়েই রবীন্দ্রনাথ কি রকম মুগ্ধ হয়েছিলেন তা নিবেদিতার মৃত্যুর পর লিখিত একটি প্রবন্ধে তিনি প্রকাশ করেছিলেন। সেই প্রবন্ধে কবি লিখেছিলেন :

"ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয়, তখন তিনি অল্পদিন মাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণত ইংরেজ মিশনারি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর লোক; কেবল ইঁহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।...তাহার পরে

মাঝে মাঝে নানাদিক দিয়া তাঁহার পরিচয় লাভের অবসর আমার ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম। নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। এই আত্ম-বিসর্জনের পশ্চাতে কত বড় একটা শক্তি, ইহার সঙ্গে কি বুদ্ধি, কি হৃদয়, কি ত্যাগ; প্রতিভার কি জ্যোতির্ময় অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পেলেন নিবেদিতা একটি ঘটনার ভেতর দিয়ে। রাজদ্রোহের অভিযোগে মহারাষ্ট্রের জননায়ক, বালগঙ্গাধর তিলক ধৃত ও দণ্ডিত হলেন। এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথ খুব বিচলিত হলেন। তিলকের মোকদ্দমা পরিচালনার সময় কবি অর্থ সংগ্রহে সাহায্য করলেন। তারপর রাজদ্রোহ আইনের বিরুদ্ধে টাউন হলে বিরাট প্রতিবাদ সভায় 'কণ্ঠরোধ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন। তখন থেকেই নিবেদিতার ধারণা হোলো, ইনি কেবলমাত্র কল্পনাবিলাসী কবি নন, বাস্তব জগতের সঙ্গে, দেশের পরাধীনতার বেদনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে—দেশের স্বাধীনতা-স্পৃহার এবং আন্দোলনের সঙ্গে আছে তাঁর প্রাণের প্রত্যক্ষ যোগ। সেইদিন থেকে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার চক্ষে পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলেন।

কবি আসেন কখনো কখনো বাগবাজারে। শক্তিময়ী এই নারীর দৃষ্টির সামনে রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্যের জগৎ খুলে যায়। অপরূপ সুমধুর কণ্ঠে কবি তাঁর নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করেন, নিবেদিতা মুগ্ধ হয়ে শোনেন, আনন্দে ভরে ওঠে তাঁর মন। তাঁর সাদাসিধা সজ্জাহীন ঘরটিতে নিবেদিতা সমাদর করে কবিকে বসান —জোড়াসাঁকোর প্রাসাদতুল্য বাড়ির কাছে নিবেদিতার বাসভবন নগণ্য। তবু এই দীপ্তিময়ী শক্তিময়ী নারীর অন্তরের প্রবল আকর্ষণে আসেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি এলে পরেই গানের আলোয় আর

আনন্দের হাওয়ায় সেই সামান্য ঘরটি যেন গম্‌গম্‌ করে উঠতো। রবীন্দ্রনাথ বসে বসে এই বিদেশিনী নারীর প্রাণের প্রাচুর্য ও অন্তরের সৌন্দর্য দেখতেন আর বিস্ময় বোধ করতেন।

ক্রমে দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হোলো। দু'জনের মধ্যে কত ভাবের আদান-প্রদান হয়। একদিন নিবেদিতা এসেছেন জোড়াসাঁকোয়। কবির ইচ্ছা তাঁর ছোট মেয়েটিকে ভালো করে ইংরেজি শেখাবেন।

—মাধুরীকে পড়াবেন? প্রস্তাব করেন রবীন্দ্রনাথ।

—কী পড়াবো? প্রশ্ন করেন নিবেদিতা।

—ইংরেজি। ঐটাই ওকে ভালো করে শেখাতে চাই।

—সে কি, ঠাকুরবাড়ির মেয়েকে মেম তৈরি করবেন?

—ইংরেজি ভাষাটা শেখাতে চাই।

—কিন্তু বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষায় নিজের জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে চাপা দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই।

কবি এর প্রতিবাদ করলেন না। নিবেদিতার কথার যুক্তি তাঁর অন্তর স্পর্শ করল। এরপর আরেক দিন তিনি নিবেদিতাকে শিলাইদহে যেতে নিমন্ত্রণ করলেন। নিবেদিতা কবির সঙ্গে এলেন এখানে। উদ্দাম, উচ্ছ্বসিত আর তরঙ্গমন্দ্রিত পদ্মার তীরে শিলাইদহের দৃশ্য দেখে নিবেদিতা মুগ্ধ হলেন। পদ্মার তীরে সূর্যোদয় দেখলেন তিনি। চাষীরা লাঙ্গল কাঁধে মাঠে এসেছে। ছুটে গেলেন নিবেদিতা তাদের কাছে। তাদের সঙ্গে গেলেন তাদের গাঁয়ে। কৃষকদের পরিচ্ছন্ন কুটীরের দাওয়ায় বসে কৃষক-পত্নীর সঙ্গে গল্প করলেন। তাদের সঙ্গে চিড়ে কুটলেন, ধান ভানলেন। তাদের হাতের তৈরি নাড়ু-মোয়া খেলেন। পল্লীবাংলার অপরূপ রূপ দেখে সে কী আনন্দ নিবেদিতার। শিলাইদহে চাষী-গৃহস্থের রান্নাঘর, শোওয়ার ঘর, ঢেঁকির ঘর, গোয়াল ঘর সব কিছুই তিনি দেখলেন।

দেখলেন মেয়েদের তৈরি নক্সী কাঁথা, দোলাই, কুলো-ডালা, মাটির পুতুল, বেতের কাজ, বাঁশের কাজ। সেইসব বিচিত্র পল্লীশিল্প দেখে মুগ্ধ হলেন নিবেদিতা। ধানবনের ফাঁকে ফাঁকে, পদ্মার তরঙ্গিত বাকে বাকে হাজার-হাজার জেলে-জোলা, মাঝি-মাল্লা ও চাষীর যে সহজ জীবন পরিপ্লাবিত হয়ে রয়েছে, শিলাইদহে এসে নিবেদিতা যেন সেই জীবনের সন্ধানে মেতে উঠলেন। এখানকার কুটীরে দীপাধারের স্নিগ্ধ আলো, মাঙ্গল্যের আল্পনা, নতুন ধানের সোনার শীষ—সবকিছু মিলিয়ে তাঁর মানস-কল্পনার নিভৃতে জাগিয়ে তুললো এক কিরণবর্ণা অনুভূতি। নিবেদিতার এইরূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ যারপর নাই বিস্মিত হোলেন।

জোড়াসাঁকোর আর একটি প্রতিভা অবনীন্দ্রনাথ।

এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই বিশ্বশিল্প-দরবারে তাঁর আবির্ভাব, ভারতে চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছিল। নিবেদিতার মধ্যে এক আশ্চর্য শিল্প-চেতনা দেখে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। ছবি আঁকেন তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে, আর তার মর্মকথা ব্যাখ্যা করেন বিদেশিনী নিবেদিতা। ভারতের নবশিল্পের প্রচারে নিবেদিতার দান অপরিসীম। অবনীন্দ্রনাথ ও অসিত-নন্দলাল প্রমুখ তাঁর শিষ্যদের কত চিত্রের লিপিভাষ্য তিনি 'প্রবাসী', 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকার পৃষ্ঠায় রেখে গিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার উন্মেষের প্রথম যুগে এই দেশে দেখা দিয়েছিল বিরাট জাতীয় আন্দোলন। তখন থেকেই তিনি বিদেশী অঙ্কন-পদ্ধতি ছেড়ে আঁকতে থাকেন 'কৃষ্ণলীলা,' 'বুদ্ধ ও সুজাতা' প্রভৃতি আশ্চর্য সব চিত্র। নতুন যুগের নতুন ধারা—নিবেদিতা হলেন তার ভাষ্যকার। নিবেদিতাকে অবনীন্দ্রনাথ প্রথম যখন দেখেন তাঁর তখনকার মনের ভাব তিনি বর্ণনা করেছেন এইভাবে ঃ

"কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি। গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে শাদা ঘাগরা। গলায় ছোট্ট ছোট্ট রুদ্রাক্ষের এক ছড়া মালা; ঠিক যেন শাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি। মাথার চুল ঠিক সোনালী নয়, সোনালি রূপোলিতে মেশানো, উঁচু করে বাধা। অনেক সুন্দরীকে দেখেছি তাঁর কাছে নিমেষে প্রভাহীন হয়ে যেতে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠলো। নিবেদিতা যেন সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। কী একটা মহিমা ছিল তাঁর।"

বাংলার নবশিল্পজাগরণের ইতিহাসে নিবেদিতা একটি প্রেরণা। ভারতের শিল্প-আত্মার যথার্থ পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন বলেই না এই তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমির সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মাধুর্যভরা ছোট ছোট আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মের যোগ কত গভীর, তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বহু রচনার মধ্যে তাঁর অম্লান স্বাক্ষর রেখে গেছেন তিনি। নন্দলাল বসুর প্রসিদ্ধ 'সতী' ছবিখানির অমন গভীর ব্যাখ্যান তিনি ভিন্ন আর কে লিখতে পারত? তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা' ছবিখানি যখন ছাপা হোলো, নিবেদিতা তখন তার ওপর একটি গোটা প্রবন্ধই লিখে ফেললেন। ভারতের শিল্পমহিমার প্রচারে নিবেদিতার দান তাই আমরা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।

আচার্য নন্দলাল বসু নিবেদিতার পরম স্নেহের পাত্র ছিলেন। অজন্তা গুহার মনোরম দেওয়াল চিত্রগুলি নকল করে আনবার জন্য তিনিই উদ্যোগী হয়ে তাঁকে এবং অসিতকুমারকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে নন্দলাল লিখেছেন: "নিবেদিতার মুখে এমন একটা তেজস্বিতা, দীপ্তি ও পবিত্র মুখশ্রী আমি দেখেছি যা সচরাচর চোখে পড়েনা এবং একবার দেখলে কখনো যা জীবনে ভুলতে পারা

যায় না। তাঁর কাছে আমরা এত উৎসাহ পেয়েছি যে বলবার নয়। তিনি ছিলেন একজন যথার্থ শিল্পপ্রেমিক।" মোট কথা, দেশীয় চিত্রকলার উদ্বোধন-যজ্ঞে এই বিদেশিনীর সহানুভূতি অবিস্মরণীয়। তাঁর শিল্পপ্রীতি স্বপ্নের আত্মবিলাস ছিল না, তা ছিল জাগরণের আত্মপ্রত্যয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যেমন, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের সঙ্গেও তেমনি নিবিড় প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক। চল্লিশ বছর বয়সেই তিনি স্বনামধন্য হয়েছেন। ভারতবর্ষে আসবার আগেই নিবেদিতা এঁর কথা শুনেছিলেন। ১৯০০ সালে প্যারি শহরের প্রদর্শনীতে বিবেকানন্দ নিজে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেইখানে, বিশ্বের সেই বিদগ্ধসমাজে তাঁর বিশ্ববিজয়ী গুরুর মতন প্রতিভাধর এই তরুণ বৈজ্ঞানিক সেদিন ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন, নিবেদিতা স্বচক্ষে তা দেখেছিলেন। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে। প্যারি থেকে বিবেকানন্দ স্বদেশে তাঁর এক গুরুভাইকে এই সম্পর্কে একখানা পত্রে লিখেছিলেন ঃ

"আজ ২৩শে অক্টোবর। এ বৎসর প্যারিসে মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ সমাগত সজ্জন সমাগম। দেশদেশান্তরের মনীষীগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ প্যারিসে। সে বহু গৌরবপূর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হইতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের জন্মভূমির নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ জে, সি, বোস। এক যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ

সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী।"

সেই জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার প্রতি নিবেদিতা যে আকৃষ্ট হবেন, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। কলিকাতায় এসে যখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেন, তখন নিবেদিতার মনে এই ধারণা দৃঢ় হোলো যে, খ্যাতিমান এই বৈজ্ঞানিকের খ্যাতিতে ভ্রূক্ষেপ নেই। সত্যান্বেষী ও স্বল্পভাষী এই মানুষটিকে তিনি সহোদরের মতন ভালবাসতেন। সে ভালোবাসার ইতিহাস জানবার মতন। জগদীশচন্দ্র থাকতেন আপার সার্কুলার রোডে (এখনকার নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড)। কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর পরেই আচার্য বসুর ভবনটি ছিল নিবেদিতার আকর্ষণের অন্যতম স্থান। বসু-জায়া অবলা বসু নিবেদিতাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। নিবেদিতার অকৃত্রিম ভারতানুরাগ তাঁকে বসু-দম্পতীর পরম স্নেহের পাত্রী করে তুলেছিল। তাঁর প্রতি নিবেদিতার নিস্পৃহ ভালোবাসা, অনাবিল স্নেহ, জগদীশচন্দ্র জীবনে ভুলতে পারেননি। নিবেদিতার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা তিনি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত স্মরণে রেখেছিলেন।

প্রথম আলাপেই নিবেদিতা বুঝেছিলেন এই বৈজ্ঞানিক য়ুরোপের সাধারণ বৈজ্ঞানিকদের সমগোত্র নন। ইনি ভাবুক, ইনি তপস্বী। যেদিন তিনি জগদীশচন্দ্রের মুখে শুনেছিলেনঃ "জ্ঞান আর বিজ্ঞানের অনুভব এক জিনিস," সেইদিন তিনি বুঝেছিলেন এই প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর চিন্তার দানে মানবসভ্যতায় চিন্তার ভাণ্ডার একদিন সমৃদ্ধ হবে। তাঁর গবেষণার বিষয় নিয়ে পৃথিবীর পণ্ডিত-সমাজে সাড়া পড়বে। নিবেদিতার এই ধারণা মিথ্যা হয়নি। নিবেদিতা আরো লক্ষ্য করলেন যে, নিজের বিজ্ঞানচর্চায় নিরলস ভাবে নিমগ্ন এই বৈজ্ঞানিক যেন একা। একে নিঃসঙ্গ তার ওপর নানা প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে তাঁকে চলতে হয়। সেই তাঁর সংকটের

দিনে যখন তিনি একাকী সংগ্রাম করে চলেছেন, তখন একমাত্র নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন, যেমন দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ আর নিবেদিতার কাছ থেকে অমন উৎসাহ তিনি যদি না পেতেন, তা হোলে তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুশীলন অতখানি সাফল্যলাভ করত কি না সন্দেহ—এই কথা জগদীশচন্দ্র নিজেই বলেছেন।

জগদীশচন্দ্রের প্রতিভায় নিবেদিতার অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি দেখেছিলেন তাঁর মধ্যে একজন সত্যান্বেষী বৈজ্ঞানিককে। বাগবাজারের সেই বোসপাড়া লেনের বাড়িতে এসে জগদীশচন্দ্র কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করতেন। এই সময়ে তিনি একটি নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলেন, তা নিয়ে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়ে যায়। ভারতবাসীও যে য়ুরোপীয়ানদের মত মৌলিক বিজ্ঞানচর্চায় তাদের প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে, জগদীশচন্দ্র তাই প্রমাণ করতে চাইলেন। বিশ্ববিশ্রুত রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও এই সময়ে রসায়নে ঐরকম অনুশীলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র দুজনেই আসতেন বাগবাজারে ভগিনীনিবাসে। নিজের হাতে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দিয়েছিলেন নিবেদিতা। শুধু তাই নয়। দেশবিদেশের খবরের কাগজগুলিতে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে যাতে আলোচনা হয়, নিবেদিতা নিজে তার চেষ্টা করেছিলেন। এইভাবে তাঁর স্বদেশবাসীর উপেক্ষা ও অনাদরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা শুধু জগদীশচন্দ্রের কাজ সুগম করে দেননি, বিশ্বের সামনে এনে তাঁর প্রতিভাকে তিনি তুলে ধরেছিলেন। জগদীশচন্দ্র যেমন, তাঁর পত্নী লেডি অবলা বসুও তেমনি নিবেদিতার বিশেষ অনুরাগিনী ছিলেন।

জগদীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'বসু-বিজ্ঞানমন্দির'-এর ভেতরে যাঁরা

গিয়েছেন তাঁরাই জানেন যে, কি চমৎকারভাবেই না তিনি এই মহীয়সী মহিলার স্মৃতিকে সেখানে অক্ষয় করে রেখেছেন। এই বিজ্ঞান-ভবনের প্রবেশ পথেই শাদা পদ্মফুলে পরিপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। তারই গা ঘেঁষে উঠেছে একটি সুন্দর মর্মর ফলক—তাতে উৎকীর্ণ দীপহস্তে যে নারী মূর্তিটি দেখা যায় তিনিই নিবেদিতা। "আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পিছনে ভগিনী নিবেদিতার প্রেরণা ও আন্তরিক সহযোগিতা আমি আজ সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করছি"—এই কথা বলেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধন বাসরে।

জাগ্রত বাংলার আর একটি পীঠস্থান ডন্ সোসাইটি।

আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা।

সেই ডন্ সোসাইটি হোয়ে উঠলো নিবেদিতার আর একটি। এই ডন্ সোসাইটি তখন হয়ে উঠেছে স্বদেশী সেবার পাঠশালা। বিবেকানন্দের অন্যতম সহপাঠী ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর মৃত্যুর বৎসরেই এই ডন্ সোসাইটি (Dawn Society) প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় জীবনে এক নব-প্রভাতের আশা বহন করেই সোসাইটির আবির্ভাব বাংলার জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পাঁচ বছর আগে এর মুখপত্র 'ডন্' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ডন্ সোসাইটির গোড়া থেকেই নিবেদিতা এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। বাংলার তখনকার বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এই সোসাইটিতে বক্তৃতা করতেন—নিবেদিতা ও স্বামী সারদানন্দও বক্তৃতা করতেন। তাঁর বক্তৃতায় আকৃষ্ট হোয়ে বাঙালী যুবক সেদিন দলেদলে স্বদেশসেবার ব্রত গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। ডন্ সোসাইটির মঞ্চ থেকে স্বদেশ-প্রেমের যে বাণী নিবেদিতার কণ্ঠকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয়েছিল, আসলে তা ছিল তাঁরই গুরু স্বামী বিবেকানন্দের বাণী। এইভাবে ডন্

পত্রিকায় লিখে এবং ডন্ সোসাইটিতে বক্তৃতা করে নিবেদিতা তাঁর গুরুর স্বদেশমন্ত্রের অগ্নিক্ষরা বাণী বাংলা তথা সমগ্র ভারতে সেদিন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন। সন্ন্যাসিনী নিবেদিতাও তাই ভারতের সেবায় নিজের জীবনটাকে এমন করে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর এই অকৃত্রিম ভারতপ্রীতির পরিচয় তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর কয়েকখানি পুস্তকের মধ্যে। তাঁর প্রতিভা, মনীষা, পাণ্ডিত্য, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রখর অন্তর্দৃষ্টি, সকলের ওপর তাঁর ভারতপ্রেম—এর সুস্পষ্ট পরিচয় তিনি রেখে গেছেন তাঁর রচিত বারোখানি পুস্তকের মধ্যে। তিনি যেভাবে ভারতীয় ভাব, ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় আদর্শ, এর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সুষমা ও সৌন্দর্যকে তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে বিকশিত করে গিয়েছেন, তা আমাদের চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকবে। নিবেদিতার সাহিত্য-সৃষ্টি ছিল বহুমুখী ও বিচিত্র। ধর্ম, ইতিহাস, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, লোককাহিনী, পুরাণ, শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ভারতের তীর্থ মহিমা, ভারতের নারী—এমন কোনো বিষয় নেই যা নিবেদিতা আলোচনা করেন নি। সে আলোচনা যেমন গভীর তেমনি শ্রদ্ধাপূর্ণ। ***The Web of Indian Life*** বইখানিতে নিবেদিতা ভারতবর্ষের জীবনধারার এমন সুনিপুণ ব্যাখ্যা করেছেন, যা তাঁর আগে আর কোনো ভারতবাসী করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই বইখানির প্রশংসা করেছিলেন এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কবি এর একটি ভূমিকাও লিখে দিয়েছিলেন।
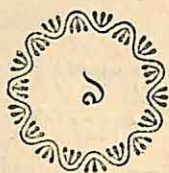
শুধু স্কুল নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবার সংকল্প ছিল না নিবেদিতার। তাঁর ছিল অনেক কাজ—বাঙালীর জাতীয় জীবনের দিকে দিকে প্রসারিত ছিল সেই কাজ। গুরুর মৃত্যুর পর তাই দেখা গেল যে, রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তিনি নামে মাত্র যুক্ত রইলেন। এখন তিনি সারা দেশকে জাগিয়ে তোলার ভার নিলেন। এখন থেকে গুরুর 'ভারত মন্ত্র' হোয়ে উঠলো তপস্বিনীর সর্বক্ষণের জপের মন্ত্র। গুরুর যে আদর্শ ছিল মানুষ তৈরি করা, সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিবেদিতা। তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশ টলমল হোল। সুদূর বোম্বাই, সেখান থেকে নাগপুর, সারা ভারতকে জাগিয়ে তোলার মন্ত্র লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে উচ্চারণ করলেন তিনি। বরোদায় পরিচয় হোল শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে—এ ছিল যেন একই পথের দুই পথিকের সাক্ষাৎকার। নিবেদিতার সঙ্গে আলাপ করে অরবিন্দ বুঝলেন, রামকৃষ্ণ যেমন বিবেকানন্দকে রেখে গিয়েছিলেন, বিবেকানন্দও তেমনি রেখে গিয়েছেন নিবেদিতাকে তাঁর সকল বৈপ্লবিক চিন্তার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসাবে। নিবেদিতার অনুরোধেই অরবিন্দ বরোদা থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন স্বদেশী যুগের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে।

১৯০৬, ৩রা ডিসেম্বর, বাংলা ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১০।

বাংলার শিরে অকস্মাৎ বজ্র পড়লো।

তখন লর্ড কার্জনের আমল। এই দুর্জন কার্জন বাঙালীকে কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। তাই তিনি শাসনব্যবস্থার সুবিধা হবে, এই ওজুহাতে বাংলা দেশকে দু'ভাগ করবার প্রস্তাব করলেন। ঐ তারিখে কলিকাতা গেজেটে বেরুলো সেই খবর। তখন বাংলা দেশ বলতে বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলা—এই বোঝাতো।

—

বাংলা ভাগ হবে।

কথাটা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল।

এক দেশ ভেঙে দু'টুকরো হবে। এক ভাষায় কথা বলে যারা, তারা আলাদা হয়ে যাবে—এমন অদ্ভুত কথা কেউ কখনো শোনেনি। কাগজে এই নিয়ে অনেক আলোচনা হোল। বাংলার বড় বড় নেতারা সবাই মিলে পরামর্শ করলেন। বিলাতের পার্লামেণ্ট থেকে বড়লাটের এই প্রস্তাব এখনো পাশ হোয়ে আসেনি। এখনো হয়ত উপায় আছে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বিলাতে ভারত-সচিবের কাছে একটা প্রতিবাদপত্র পাঠাতে হবে। সেই স্মরণীয় প্রতিবাদপত্রটি মুসাবিদা করলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। তিনিই তখন জাতির মুকুটহীন সম্রাট। প্রতিবাদ পত্রটিতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে হাজার হাজার লোকের সই ছিল। জেলায় জেলায় গিয়ে এইসব স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছিল। নিবেদিতারও তাতে একটি স্বাক্ষর ছিল। রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। গণ্যমান্য সকল নেতারই স্বাক্ষর ছিল তাতে। এমনি করে প্রায় আশী হাজার লোকের সই-করা সেই প্রতিবাদপত্রটি যথাসময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হোল বিলাতে ভারত-সচিবের কাছে।

সকলেই আশা করেছিলেন এ আবেদন বিফল হবে না।

১৯০৪ শেষ হয়ে কেটে ১৯০৫ শুরু হোল। বাংলার নেতারা সবাই

উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু অপেক্ষা করাই সার হোল। ফল কিছুই হোল না। বরং ভাগের মাত্রাটা আগের থেকে একটু বেড়ে গেল। ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই বিলাত থেকে জবাব এলো পার্লামেণ্ট লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। এইবার প্রস্তাবটি একটি আইন করে ঘোষণা করা হবে।

বাংলা ভাগ হবে।

বাঙালীর মাথায় তখন বজ্রাঘাত হোল।

সঞ্চার হোল তার অন্তরে নিদারুণ বিক্ষোভ আর বেদনা।

সেই বেদনা, সেই বিক্ষোভ গিয়ে বাজলো নিবেদিতার অন্তরে। দেখতে দেখতে শুরু হয় বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন। আন্দোলনের জোয়ারে ডুবু ডুবু হয় বাংলা দেশ। তার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয় নিবেদিতার। অগ্নিশিখার মতো তিনি সর্বত্র ছুটোছুটি করতে লাগলেন। একদিন অনুশীলন সমিতির এক সভায় তিনি বাঙালী যুবকদের উদ্দেশ করে বললেনঃ "আজকে তোমরা স্মরণ করো স্বামীজীর সেই প্রাণবাণী—"তোমার দেবতা আজ চায় তোমার জীবন বলি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তোমার সাম্‌নে তোমার এক-মাত্র উপাস্য দেবতা সে তোমার জননী জন্মভূমি।"

উনিশ শো পাঁচের প্রত্যূষে বাঙালীর কানে এলো আর একটি নতুন চেতনা মন্ত্র—যে মন্ত্র এতদিন ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বইএর মধ্যে। উষার নবারুণ আলোকে সহসা সেই মন্ত্র যেন হোয়ে উঠলো প্রাণময়। সেই মহামন্ত্র এলো পুঁথি থেকে প্রাণে। লক্ষ লক্ষ বাঙালীর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হোল মাতৃপূজার মন্ত্র ঃ বন্দেমাতরম্।

আর সেদিন আশ্বাসের বাণী নিয়ে বাঙালীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে-ছিলেন জাতির কবি রবীন্দ্রনাথ। কবির কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হোয়ে ওঠে জাগরণের এক নতুন মাঙ্গলিক। রাত্রির অন্ধকারে নেতারা যখন সমবেত হোয়ে বিলাতি বর্জনের শপথ গ্রহণ করার সংকল্প করছেন,

তখন কবির কাছ থেকে এলো একতাবদ্ধ হবার এক অভিনব প্রেরণা, এক নতুন উৎসাহ। কবি লিখলেন :—

বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান।
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণে বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

১৯০৫ সাল। ৩১শে আগষ্ট। বাংলা আশ্বিন মাস।

উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় আশ্বিনের রাত জেগে কাটিয়েছে সবাই। তাদের আশা ছিল যে হয়ত শেষ মুহূর্তে বড়লাটের মনে শুভবুদ্ধি জাগতে পারে, জনমতকে তিনি হয়ত অস্বীকার করবেন না, হয়ত বাংলা ভাগ না-ও হোতে পারে। কিন্তু ১৬ই আশ্বিনের সকাল-বেলায় ক্ষীণ আশাটুকুও আর রইল না। ১লা সেপ্টেম্বর সিমলা থেকে সরকারী ভাবে বঙ্গবিভাগ ঘোষিত হোল। সেদিনের প্রভাতী সংবাদ-পত্রে সকলে জানতে পারলো সেই নিদারুণ সংবাদ। কে যেন বাঙালীর হৃদয়ে শেলের আঘাত হানলো। মানচিত্রে এক বাংলা— পূর্ব বাংলা আর পশ্চিম বাংলা হোয়ে দেখা দিলো। এক ভাষাভাষী বাঙালী, কার্জনের কলমের খোঁচায় দুই ভাগে আলাদা হোয়ে গেলো।

কিন্তু সেই সঙ্গে বাঙালীর জীবনে এলো নতুন প্রভাত। আর সেই নতুন প্রভাতের আলো ছড়িয়ে পড়লো সারা ভারতে। হোল রাখীবন্ধন। বেদনার প্রতিঘাতে মিলনের রাখীসূত্র হাতে বেঁধে বাঙালী শপথ নিলো : ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই। আর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সকল বাঙালীর কণ্ঠে ধ্বনিত হোল : এক জাতি, এক প্রাণ, এক ভগবান। এইভাবে সেদিন বাংলাদেশে শুরু হোল একটা আন্দোলন। ইতিহাসে এরই নাম বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলন।

নব জাগরণের প্রাণসঙ্গীতে ভরে উঠলো বাংলার আকাশ বাতাস। কার্জন দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করলেন—বাংলা ভাগ হোয়েছে, এ আর রদ হবেনা। গর্জন করে উঠলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, এ অন্যায় বিধান আমরা মানব না, একে আমরা রদ করবই। রবীন্দ্রনাথের রুদ্র বীণায় বেজে ওঠে গানের পর গান। সিডিশন আইনের শৃঙ্খল ঝঙ্কারে বাংলার কবিদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় মাতৃবন্দনা। নেমে আসে দুকূলপ্লাবী প্রাণবন্যা বাংলার বুকে। নেমে আসে বাঙালীর হৃদয়ে।

দেখতে দেখতে এক নতুন স্পন্দনে স্পন্দিত হোয়ে উঠলো বিংশ শতকের বাংলা। ভাঙা বাংলা রাঙা হোয়ে ওঠে স্বদেশীর অরুণ আলোকে। বাংলায় শুরু হয় স্বদেশী যুগ—স্বামী বিবেকানন্দ এরই ইঙ্গিত করে গিয়েছিলেন। বেঁচে থাকলে হয়ত তিনিই এর নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন। স্বামীজী নেই—কিন্তু নিবেদিতা আছেন। স্বদেশী-যুগের নায়কদের পাশে এসে দাঁড়ালেন বিপ্লবী নায়িকা নিবেদিতা। তাঁরই বাগবাজারের বাড়িতে 'যুগান্তর' পত্রিকা বের করবার সব পরিকল্পনা ঠিক হয়। তাঁরই নির্দেশে সেই পত্রিকার সম্পাদক করা হয় বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে। স্বদেশী আন্দোলন যখন তীব্র হোয়ে উঠলো তখন বিপ্লবের বিষাণ বেজে ওঠে

বাঙালীর কণ্ঠে। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি সরকারী আদেশে যখন নিষিদ্ধ হোল, তখন বেরুলো ইংরেজি কাগজ, 'বন্দেমাতরম্'। অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি যুক্ত ছিলেন এই কাগজের সঙ্গে। তাঁদের নির্ভীক লেখনীমুখে ব্যক্ত হয় বাংলার দাবী। নিবেদিতা এইসব নেতাদের পাশে এসেই সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন রণ-রঙ্গিনী মূর্তিতে। তাঁর চরণে যেন ঝঙ্কার মঞ্জীর বেজে উঠলো।

নিবেদিতা আহ্বান করলেন বাঙালী সন্তানদের। বললেন—স্বদেশী তোমার জীবন-মরণ সংগ্রাম। এই আন্দোলনে তিনি শুধু বক্তার আসন গ্রহণ করেন নি, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করেছিলেন যার ফলে শীঘ্রই পুলিশ তাঁর গতি-বিধি লক্ষ্য করতে থাকে। একদিন। সন্ধ্যাবেলা। 'যুগান্তর' পত্রিকার অফিসে বসে আছেন নিবেদিতা। তাঁকে ঘিরে বসে আছেন জনকতক জাতীয়তাবাদী তরুণ বিপ্লবী। একজন প্রশ্ন করলেন—আমরা ভুল পথে যাচ্ছি কি না? অমনি নিবেদিতা বললেন—দেশের ক্লীবত্ব ঘুচাবার জন্য হিংসা আর বিপ্লবকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করাই এখন কর্তব্য। আয়ার্ল্যাণ্ড তাই করেছিল। আর একজন প্রশ্ন করলো—পরিণামে কি ঘটতে পারে? নিবেদিতা প্রশান্ত স্বরে বললেন—তা আমি জানি না। তোমাদের নির্ভীক হোতে হবে—গুরুজী এই কথা বলে গেছেন। তোমাদের বুকের রক্তে যেন কাপুরুষতার সকল অপবাদ ধুয়ে মুছে যায়। আর একজন জাতীয়তাবাদী নেতা প্রশ্ন করেন—বোমা ফাটাবার সত্যিকারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? নিবেদিতা অবিচল কণ্ঠে উত্তর দেন—নিশ্চয়ই আছে।

শীঘ্রই পুলিশের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো নিবেদিতার ওপর। গ্রেপ্তার অথবা নির্বাসন—যে কোনো মুহূর্তে সম্ভব। খবরটা শুনলেন তিনি। হাসলেন মনে মনে। নির্বাসন বা কারাগার, তিনি কিছুরই ভয় করতেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কয়েকজন নেতার অনুরোধে তিনি

কিছুদিনের জন্য ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যেতে রাজী হোলেন। তিনি লণ্ডনে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর মন পড়ে রইলো ভারতবর্ষে—বাংলা দেশে—বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের সেই ছোট্ট স্কুল বাড়িটিতে, যেখানে বসে গুরুর মৃত্যুর পর তিনি এতদিন সহস্র কর্মের আবর্ত রচনা করেছিলেন। রচনা করেছিলেন জাগ্রত বাংলার মহিমোজ্জ্বল এক ইতিহাস। এই স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে তিনিই উত্তরকালে লিখেছিলেন ঃ "স্বদেশী আন্দোলন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাংলার একক সাধনা। এই আন্দোলন ভারতবর্ষকে তার আত্মোপলব্ধির আদর্শ দিয়েছে।"
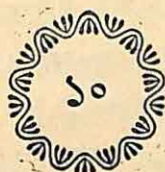
স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে নিবেদিতার জীবনের একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা বুদ্ধগয়াদর্শন। ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে তিনি কিছুদিনের জন্য বুদ্ধগয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তাঁর এই ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর পত্নী অবলা বসু, ভগিনী ক্রিষ্টিন, স্বামী সদানন্দ, ব্রহ্মচারী অমূল্য (পরবর্তীকালে ইনিই স্বামী শঙ্করানন্দ নামে পরিচিত হন ও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত করেন), ঐতিহাসিক যত্নাথ সরকার ও 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক র্যাটক্লিফ সাহেব। এর আগে নিবেদিতা সাঁচীর ধ্বংস-স্তুপের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের অনুপম নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এইবার বুদ্ধগয়ায় এসে তিনি পরম পুলকিত চিত্তে ভগবান বুদ্ধের জীবনের মহিমা স্মরণ করলেন। তাঁর গুরুর পুণ্যস্মৃতি এই স্থানটির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। "আমি ভগবান বুদ্ধের দাসানুদাস"—এই কথা তিনি কতবার শুনেছিলেন তাঁর গুরুর মুখে। তাইতো বুদ্ধগয়া দর্শনের জন্য তিনি এমন ব্যাকুল হয়েছিলেন।

তীর্থযাত্রিদল যথাসময়ে রাজগৃহে এসে উপস্থিত হোলেন। রাজগৃহের প্রাকৃতিক শোভা, তার চারদিকে ধ্যানগম্ভীর পর্বতমালা, এখানে ওখানে ছড়ানো কত শিলালেখ ও ধ্বংসাবশেষ—তার মধ্যে উৎকীর্ণ রয়েছে অতীতকালের গৌরব কাহিনী—নিবেদিতা এইসব

দেখে যারপর নাই আনন্দিত হোলেন। রাজগৃহ ভ্রমণের এই স্মৃতি তিনি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর *Foot falls of Indian History* নামক বইতে। সেই বইতে তিনি লিখেছেন ঃ "এখনো যেন রাজগৃহের প্রতি গুহায় বুদ্ধদেবের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।"

আচার্য যদুনাথ সরকার এই ভ্রমণ-প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "সন্ধ্যাকালে আমরা সবাই বোধিবৃক্ষের নীচে বসে ধ্যান করতাম। বুদ্ধদেব যে বোধিবৃক্ষের নীচে বসে আড়াই হাজার বছর আগে নির্বাণ লাভ করেছিলেন, এ গাছটা তারই বংশধর। গাছের কিছুদূরে একখানা গোল পাথর পড়েছিল, তার উপর একটা চিহ্ন খোদাই-করা ছিল। নিবেদিতা পাথরটির কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সেই চিহ্নটি লক্ষ্য করলেন এবং শেষে আমাদের বললেন—ইহাই ইন্দ্রের বজ্র—এই বজ্রটি ইন্দ্র স্বয়ং বুদ্ধদেবকে দিয়েছিলেন। এই চিহ্নটিকে আমাদের জাতীয় চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করা কর্তব্য।* সন্ধ্যাবেলা নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ ও আমরা একসঙ্গে বেড়াতে বের হতাম। একদিন বেড়াতে বেড়াতে সুজাতার উরুবিল্ব গ্রামে এসে নিবেদিতার কী আনন্দ। উৎসাহ ও আনন্দের আতিশয্যে তিনি সেই গ্রামের কিছু মাটি তুলে নিয়ে মাথায় স্পর্শ করলেন। বললেন, সুজাতার গ্রামের মৃত্তিকা পবিত্র।"

তারপর বৌদ্ধবিদ্যাপীঠ নালন্দা ও বৌদ্ধতীর্থ সারনাথ দর্শন করে নিবেদিতা কলিকাতায় ফিরলেন।

১৯০৫ সালে কাশীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। নিবেদিতা এই অধিবেশনে যোগদান করে ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয়

* নিবেদিতা স্বয়ং এই চিহ্নটিকে তাঁর পুস্তকের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের শীর্ষদেশে জগদীশচন্দ্র এই চিহ্নটিই স্থাপিত করেছেন। এই পুস্তকের প্রচ্ছদপটে নিবেদিতার সেই প্রিয় প্রতীকটিই ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্যক্তিদের কাছে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেলেন। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। সভামণ্ডপের সিংহদ্বারে যখন গোখলে এসে পৌঁছলেন তখন নিবেদিতাই সকলের আগে তাঁকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করলেন ও তাঁর ললাটে পবিত্র চন্দন-তিলক এঁকে দিয়ে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। যাঁরাই সেদিন সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁরাই নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না করে পারেন নি। এমনি করে ভারতবর্ষের সুখদুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম হোয়ে যাওয়া একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যার পক্ষেই সম্ভব—এই চিন্তা সকলের মনে জেগেছিল সেদিন

এইসময় কাশীর তিলভাণ্ডেশ্বর গলিতে একটা বাড়িতে নিবেদিতা থাকতেন। সেইখানে ভারতের নেতারাও (যাঁরা কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে কাশী এসেছিলেন) ভবিষ্যৎ-ভারতের সুনির্দিষ্ট পন্থার সন্ধানের জন্য মনস্বিনী নিবেদিতার সঙ্গে দিনের পর দিন অন্তরঙ্গ আলোচনা করে তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ ও প্রেরণা—দুই-ই পেয়েছিলেন। ঐ তিলভাণ্ডেশ্বরের বাড়িতেই গোখলে ও অন্যান্য নেতাদের সম্মিলিত চেষ্টায় স্থাপিত হয় ভারত-সেবক সঙ্ঘ বা 'সার্ভান্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি'।

১৯০৬ সালে নিবেদিতা অসুস্থ হলেন। এত কাজ তাঁর শরীর বইতে পারল না। বরিশালে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সংবাদ পেয়ে অশ্বিনী-কুমার দত্তের আহ্বানে তিনি গিয়েছিলেন সেখানে। সেখান থেকে ফিরে এসে প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হলেন। ভালো করে সুস্থ হোয়ে উঠতে না উঠতেই উড়িষ্যা এলো দুর্ভিক্ষের সংবাদ। অসুস্থ শরীর নিয়েই নিবেদিতা ছুটলেন উড়িষ্যায়। এমনি করেই সেদিন লোকমাতা নিবেদিতা বাংলার দুর্গতদের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। উড়িষ্যা থেকে ফিরলেন টাইফয়েড জ্বর

নিয়ে। অনেকদিন ভুগেছিলেন তিনি এই অসুখে। চিকিৎসা করলেন স্যার নীলরতন সরকার, সেবা-শুশ্রূষা করলেন জগদীশচন্দ্র বসু, তাঁর স্ত্রী অবলা বসু আর ভগিনী ক্রিষ্টিন। একটু সুস্থ হোয়ে তিনি কিছুদিনের জন্য ভারত ত্যাগ করে লণ্ডনে এলেন।

লণ্ডনে এসেই খবর পেলেন তাঁর মায়ের অন্তিম সময়। মা-কে তিনি কথা দিয়েছিলেন, যেখানেই থাকুন, তাঁর অন্তিমকালে তিনি মায়ের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকবেন। এলেন একদিন মায়ের কাছে। দেখলেন মায়ের জীবনীশক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে। প্রিয়তম কন্যাকে দেখে মেরী ইসাবেল প্রাণে অপার শান্তি অনুভব করলেন। এর অল্প কয়েকদিন পরে ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে করতে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করলেন। মায়ের মৃত্যুতে নিবেদিতার মনে পড়ে যায় বৃদ্ধা গোপালের মায়ের মৃত্যুর কথা। রামকৃষ্ণকে তিনি গোপালের মত জ্ঞান করতেন। তাঁর অদ্ভুত জীবন-কথা শুনে ও তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভ করে নিবেদিতা মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই গোপালের মায়ের (অঘোরমণি দেবী) শেষজীবনে নিবেদিতা তাঁকে তাঁর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে এনে সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। তাঁরো মৃত্যুকালে শয্যাপার্শ্বে ছিলেন সেবিকা নিবেদিতা।

প্রায় দু'বছর ওদেশে কাটিয়ে ১৯০৯ সালের জুলাই-এর মাঝামাঝি তিনি কলিকাতায় ফিরে এলেন। যে দু'বছর তিনি ভারতের বাইরে ছিলেন সেই সময়ে ইংরেজ সরকারের দমননীতি সারা বাংলায় একটা ভীষণ সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। এই সময়কার বিখ্যাত ঘটনা আলিপুর বোমার মামলা। নিবেদিতা বিলেত থাকতেই খবর পেয়েছিলেন যে, এই মামলায় অরবিন্দ ও আরো ছচল্লিশজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বিচারে অনেকেই কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হন। অরবিন্দ একবছর কারাবাসের পর মুক্তি পেয়েছিলেন। অরবিন্দের পক্ষে

সমর্থন করেছিলেন সেদিনকার উদীয়মান ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। ইনিই পরে দেশের কাজে সর্বস্ব ত্যাগ করে 'দেশবন্ধু' রূপে দেশবাসীর চিত্ত জয় করেন। নিবেদিতা বিদেশ থেকে ফিরে এসে দেখলেন, সে অরবিন্দ আর নেই—তাঁর চিন্তাধারা এখন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। তখন 'বন্দেমাতরম্', 'যুগান্তর' এসব পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নেতাদের অনেকেই নির্বাসিত। নিবেদিতা ফিরে এসে রাজনৈতিক আন্দোলনের এই ছত্রভঙ্গ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। জেল থেকে বেরিয়ে অরবিন্দ দুখানা নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন—ইংরেজিতে 'কর্মযোগিন্' আর বাংলায় 'ধর্ম'। নিবেদিতাকে তিনি 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় লিখতে অনুরোধ জানালেন। অরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতা আবার কর্মক্ষেত্রে নামলেন।

ঘটনার স্রোত দ্রুত প্রবাহিত হোয়ে চললো।

দেশের ভাগ্যচক্র তখন অন্যদিকে ঘুরতে আরম্ভ করেছে।

১৯১০ এর শুরুতেই ইংলণ্ড থেকে মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কারের প্রস্তাব ভারতে নেতাদের কাছে এসে পৌঁছল। ঠিক এইসময়েই অশ্বিনীকুমার, শ্যামসুন্দর, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ বাংলার নির্বাসিত নেতারা মুক্তি পেলেন। তাঁদের মুক্তি উপলক্ষে নিবেদিতা তাঁর স্কুলের প্রবেশপথে মঙ্গল-ঘট পেতে, কলাগাছ ও আমের পল্লব দিয়ে দরজাটি সাজিয়েছিলেন। এলো ইতিহাসের মহাক্ষণ। কাউকে না জানিয়ে রণগুরু অরবিন্দ একদিন সহসা নিরুদ্দিষ্ট হোলেন। তাঁর এই নিরুদ্দেশ যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন নিবেদিতা। কিছুদিনের জন্য 'কর্মযোগিন্' পত্রিকা চালালেন তিনি।

দিন যায়। ক্লান্তিতে অবসাদে ভেঙে পড়েন নিবেদিতা। তিনি আবার তীর্থভ্রমণে যেতে চাইলেন। পার্বত্য তীর্থপথের যাত্রী হোতে চাইলেন তিনি এইবার। কিন্তু মনের মতো সঙ্গী কই। তখন তিনি বসু-দম্পতীকে তাঁর ইচ্ছা জানালেন। জগদীশচন্দ্র ও অবলা বসু

দুজনেই উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে সেই বছরের গরমের ছুটিতে নিবেদিতাকে নিয়ে কেদার-বদরী যাত্রা করলেন।

—এতো জায়গা থাকতে এই দূর দুর্গম পথের তীর্থ দর্শনে আপনার এতো আগ্রহ কেন? জিজ্ঞাসা করেন অবলা বসু।

—গুরুর মুখে শুনেছি, হিমালয়ের অন্তর্দেশে হিন্দুদের যে কয়টি তীর্থক্ষেত্র আছে, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ তাদের মধ্যে প্রধান ও প্রাচীন। পাণ্ডবেরা এই পথ দিয়েই মহাপ্রস্থান করেছিলেন। স্বামীজী বলতেন, প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর কাছে এই পথের প্রতিটি ধূলিকণা চিরপবিত্র। এমন তীর্থ না দেখে কি থাকতে পারি?

নিস্তব্ধ বিস্ময়ে জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার কথাগুলি শুনে গেলেন। সেইদিন তিনি প্রথম বুঝলেন নিবেদিতার চেতনায় "এই ভারতবর্ষ কতখানি সত্য। ঋষিকেশ দেবপ্রয়াগ হোয়ে তাঁরা চলেছেন কেদার-বদরীর পথে। সুন্দর এই পথ গঙ্গার অববাহিকা ধরে চলেছে। পথের অনেক নীচে প্রবল স্রোতস্বিনী গঙ্গা। দেবপ্রয়াগ দেখে নিবেদিতার কী আনন্দ! তারপর একে একে রুদ্র প্রয়াগ, গুপ্তকাশী, গৌরীকুণ্ড অতিক্রম করে তাঁরা অবশেষে পৌঁছলেন কেদারনাথ।

তুষারাচ্ছন্ন পর্বতমালা চারদিকে। সেই রজতগিরির মাঝখানে কেদারনাথের মন্দির। যে দিকেই তাকানো যায় অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্য। নিবেদিতা দেখলেন কেদারনাথ শিবলিঙ্গ নন—কোনো মূর্তিই নন। প্রস্তরশিলায় তৈরী প্রকাণ্ড একটি আসন—অনেকখানি জায়গা জুড়ে সেই শিলাসন। অসংখ্য তীর্থযাত্রীর কণ্ঠের 'শিবোঽহম্' ধ্বনি মন্দিরের অবিরাম ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে মিলে এক সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এই পবিত্র তীর্থ দর্শনের অভিজ্ঞতা নিবেদিতা তাঁর *Kedarnath and Badrinath* বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "সাগরবক্ষ থেকে প্রায় চার হাজার ফুট উপরে কেদারনাথ। তুষারমৌলী কেদারশৃঙ্গের পাদদেশে অপরূপ

মন্দির। চারদিকে বরফের রাজত্ব, চারদিকে গলিতে তুষারের জলধারা! সম্মুখে দেবতাত্মা হিমালয়ের বিরাট রূপ। আমরা স্তব্ধ হোয়ে এইসব দেখলাম।”

তীর্থ ভ্রমণ শেষ করে জুলাই মাসের মাঝামাঝি নিবেদিতা ফিরলেন কলিকাতায়। প্রাণ তাঁর এখন গভীর শান্তিতে ভরে গেছে।

১৯১০। অক্টোবর। বোষ্টন থেকে খবর এলো মিসেস ওলিবুল (ধীরামাতা) মৃত্যুশয্যায়। আগে থেকে কথা দেওয়া ছিল তাঁর অন্তিমকালে তিনি উপস্থিত থাকবেন। তাই সংবাদ পাওয়ামাত্র নিবেদিতা ছুটলেন আমেরিকায়—উপস্থিত হোলেন বান্ধবীর রোগ-শয্যাপার্শ্বে। চিকিৎসার ব্যবস্থা যতদূর করবার করা হয়েছিল। কিন্তু ধীরামাতার জীবন রক্ষা পেলো না। মাতৃসদৃশা এই বান্ধবীর আকস্মিক মৃত্যুতে নিবেদিতা প্রাণে নিদারুণ আঘাত পেলেন। আমেরিকা থাকতেই তিনি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে নিমন্ত্রিত হোলেন। এ বড়ো কম সম্মানের কথা ছিল না। ভারত-বিখ্যাত মনীষী ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই কংগ্রেসের উদ্বোধন করেছিলেন। এমনি করেই সেদিন আন্তর্জাতিক বিদগ্ধসমাজে নিবেদিতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল হিন্দুভারতের মুখপাত্রী হিসাবে।

দিন যায়।

কাজ বাড়ে।

স্কুলের কাজ। নানা রকম পত্র-পত্রিকায়, বিশেষ করে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মর্ডান রিভিয়ু' কাগজে নিয়মিতভাবে লেখা, পল্লীর দুঃস্থ ও দুর্গতদের সেবার কথা চিন্তা করা, নিজের বই লেখার কাজ, এমনি সহস্র রকমের কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন নিবেদিতা। এসব কাজে তাঁর ক্লান্তি ছিল না কোনদিন। কিন্তু আজ তিনি যেন একটু ক্লান্ত বোধ করলেন। গুরু তাঁর ওপর যে গুরুভার দায়িত্ব অর্পণ

তারবার্তা পেয়ে কলিকাতা থেকে ছুটে এলেন ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁর চিকিৎসার জন্য। ব্যাধি বিপজ্জনক—অভিমত প্রকাশ করলেন নিপুণ চিকিৎসক। অবলা বসু দিন রাত তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন।

একদিন। সকাল বেলা।

ওষুধ ও পথ্য খাওয়াবার পর অবলা বসু জিজ্ঞাসা করেন—এখন কেমন আছেন ?

—এবার যাবই ; আমি যেন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, মিসেস বোস, হেসে উত্তর দেন নিবেদিতা।

—ও কথা বলতে নেই। আপনি সেরে উঠবেন, ডাক্তার সরকার বলেছেন।

—স্বামীজী বলেছেন আমি চুয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যেই মরব। মনে মনে হিসেব করছিলাম, আর ক'দিন বাদেই তো আমি চুয়াল্লিশে পড়ব।

রোগশয্যায় শুয়ে আছেন নিবেদিতা যেন ধ্যাননতলোচনা তাপসী। শরতের সোনালি রোদ জানালা দিয়ে এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে, বিছানায়, তাঁর ললাটে। শিয়রে বসে বসু-জায়া। মুখে তাঁর বিষাদের ছায়া আঁকা। রোগশয্যায় শুয়ে আছেন, তবু তাঁকে দেখে মনে হয় না যে তিনি কঠিন অসুখে ভুগছেন। সমস্ত মুখখানি ভরে আছে প্রীতি আর শান্তিতে। উজ্জ্বল চোখ দুটি করুণায় পূর্ণ। তাঁর অন্তরের জ্যোতি যেন রোগের সব যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে উঠেছিল। মারা যাবার মাত্র চারদিন আগেও তাঁর দিনলিপিতে 'মৃত্যু' ও 'প্রিয়তম' নামে দুটি ছোট্ট রচনা লিখলেন তিনি।

১৩ই অক্টোবর। শুক্রবার। ভোরবেলা।

প্রথম সূর্যের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘার ঘুম ভেঙেছে।

নিবেদিতার জীবনের আজ শেষ দিন।

করে গিয়েছিলেন, সেই দায়িত্ব তিনি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং ব্রত হিসাবেই তা উদ্‌যাপন করেছেন—স্কুলটিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এখন তিনি তাই ছুটী চাইলেন। স্বামী বিবেকানন্দের একখানা সম্পূর্ণ জীবন-চরিত লিখবার ইচ্ছা ছিল নিবেদিতার। সেজন্য বহু যত্নে তিনি কিছু উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু এখন যেন তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাই সংগৃহীত উপাদানগুলি স্বামী ব্রহ্মানন্দের হাতে তুলে দিলেন।

আর নয়, এইবার ছুটী চাই, একদিন এই কথা বললেন নিবেদিতা ভগিনী সুধীরাকে। তারপর একদিন তিনি এলেন বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে। সারদা দেবীকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। সারদাদেবী নিবেদিতার মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন। জগদীশচন্দ্র একদিন এলেন দেখা করতে। বললেন "আপনার শরীর তো সারছে না। আমাদের সঙ্গে দার্জিলিঙ-এ চলুন।"

সমস্ত কাজ থেকে এক দীর্ঘ ছুটি নিতে মন চাইছিলো নিবেদিতার। তাই তো তিনি জগদীশচন্দ্রের প্রস্তাবে রাজী হোলেন। তারপর স্কুল পরিচালনার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করে তিনি দার্জিলিঙ এলেন। তাঁর ক্লান্ত দেহমন এখন চির বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল হোয়ে উঠেছে। ভাবলেন তুষারশৈলপতির পায়ের কাছে পড়ে হয়তো তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম শান্তি লাভ হবে। অতীত জীবনের সুখ-দুঃখ, জোয়ার ভাঁটা, আশা-নিরাশা, প্রীতি-ভালবাসার কত কথাই না আজ তাঁর স্মৃতিপথে জেগে উঠছে। অসীমের আহ্বানে উতলা হয়ে উঠছে তাঁর দেহ-মন।

১৯১১ সালের গোড়াতেই নিবেদিতা দার্জিলিঙ এলেন। তাঁর পরিচিত সেই 'রায় ভিলা'-য় জগদীশচন্দ্র ও তাঁর পত্নীর অতিথি হিসাবে বাস করতে লাগলেন তিনি। প্রথম কিছুদিন বেশ সুস্থ শান্ত ছিলেন দার্জিলিঙ-এর নির্জন জীবনে। তারপর হঠাৎ তিনি রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হোলেন। জগদীশচন্দ্রের কাছ থেকে এক জরুরী

দিনের আলো ফুটে উঠলো। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তাঁর কণ্ঠ থেকে অনুচ্চস্বরে উদ্গীত হোল :—

অসতো মা সদ্‌গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময়
আবিরাবীর্ম এধি।

—অসত্য থেকে আমাকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর। অজ্ঞান অন্ধকার থেকে জ্ঞানের জ্যোতিতে নিয়ে চলো। মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতত্ব প্রদান কর। হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমার হৃদয়ে জ্যোতিরূপে আবির্ভূত হও। শান্তিময় হোক আমার জীবন।

এইভাবে জীবনের এ পারে দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ প্রার্থনা উচ্চারণ করলেন নিবেদিতা। শেষবারের মতো তিনি বললেন দুটি কথা—"নৌকো ডুবছে। আমি কিন্তু সূর্যোদয় দেখব।" গৌরীশৃঙ্গে তখন হয়েছে নবসূর্যোদয়। প্রভাতী আলোর প্রসন্নতার মধ্যে ফুটে উঠেছে দেবতাত্মা হিমালয়ের মৌন মহিমা। আকাশে শরতের মেঘেরা দল বেঁধে জড়ো হয়েছে। প্রকৃতি প্রশান্ত। প্রভাত সুন্দর। সেই সুন্দর প্রভাতে মহাপ্রস্থানের ডাক শুনতে পেলেন নিবেদিতা। শেষবারের মতো গুরুর ধ্যানে চোখ বুঁজলেন তিনি। 'রায়-ভিলা'র পাইন গাছের শাখায় তখন প্রভাত-সূর্যের অরুণ আভা এসে পড়েছে। সেই নবারুণ আলোকে উদ্ভাসিত পথ দিয়েই অমৃতপথযাত্রী হোলেন লোকমাতা নিবেদিতা। তখন সকাল সাতটা। অবলা বসুর কোলে মাথা রেখেই চিরতপস্বিনী নিবেদিতা তাঁর অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। হিমালয়ের নির্জন কোলে চির বিশ্রাম লাভ করলেন বিবেকানন্দের মানসকন্যা। এতো মৃত্যু নয়—যেন নিমীলিত নয়নে ভারতের ধ্যানে ডুবে গেলেন নিবেদিতা। চিরদিনের মতো নির্বাপিত হোল যজ্ঞাগ্নির পূত হোমশিখা।

এক শরতের প্রত্যুষে এই পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন তিনি। চুয়াল্লিশ বছর পরে আর এক শরতের প্রভাতে পৃথিবী অন্ধকার করে চিরবিদায় নিলেন তিনি।

জগদীশচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিবেদিতার শবদেহ বহন করে নিয়ে গেলেন। শৈলমূলে রচিত হোল সন্ন্যাসিনীর চিতাশয্যা। উত্তর দিকে মুখ করে মৃতদেহ স্থাপিত হোল চিতার ওপর। তখন বিকেল চারটে বেজে গিয়েছে। অস্তাচলগামী সূর্যের শেষ রশ্মি এসে পড়েছে নিবেদিতার মুখে। কী প্রশান্ত সেই মুখ। অশ্রুভরা চোখে অবলা বসু নিবেদিতার মাথা ও হাত গঙ্গাজলে ধুয়ে দিলেন। সমস্ত শরীরে ছিটিয়ে দিলেন গঙ্গার জল। এই জল নিবেদিতা এনেছিলেন হরিদ্বারের গঙ্গা থেকে। একটি বোতলের মধ্যে সেই জল সর্বদাই তাঁর সঙ্গে থাকতো। নতুন গৈরিকবাসে তাঁর দেহ আবৃত, মুখখানি খোলা। মনে হোল, ঘুমোচ্ছেন। ডান হাতটা বুকের ওপর ন্যস্ত, কিন্তু সেই হাতে-ধরা রুদ্রাক্ষের মালাটি আজ স্থির নিশ্চল। মুখাগ্নির আগে সমবেত কণ্ঠে শোক-গম্ভীর সুরে প্রার্থনা করা হোল—

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবিরাবীর্ম এধি।

পর্বতমালায় ওঠে সেই প্রার্থনার প্রতিধ্বনি। এক তরুণ ব্রহ্মচারী মুখাগ্নি করলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে চিতা জ্বলে উঠলো। সকলের বিহ্বল দৃষ্টির সামনে নিবেদিতার নশ্বর দেহ বহ্নিস্পর্শে মাত্র কয়েক মুঠি ভস্মে পরিণত হোল। চিতা নিভে গেল। সন্ধ্যার ম্লান আলোকে নিবেদিতার চিতাভস্ম নিয়ে সকলে নিঃশব্দে ফিরলেন। সেই পবিত্র চিতাভস্মের মধ্যে মিশে রইলো লোকমাতা নিবেদিতার জীবনের আশ্চর্য ইতিহাস। সেই ইতিহাস আত্ম-বিসর্জনের ইতিহাস। সেই ইতিহাস আজ আমাদের জাতীয় সম্পদ।

পরিশিষ্ট

ভারতের জাতীয় জীবনে বিবেকানন্দ

[১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামীজীর মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পরে ভগিনী নিবেদিতা স্বীয় আচার্যদেবের জীবনাদর্শ সম্পর্কে *Swami Vivekananda in India's National Life* এই নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। বিবেকানন্দের তিরোধানের পর তাঁর সম্পর্কে ইহাই সর্ব্বপ্রথম আলোচনা। ১৯০২ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখের মাদ্রাজের সুবিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র 'হিন্দু'তে ইহা প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধটির একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এখানে দেওয়া হোল। অনুবাদ লেখকের কৃত।]

যে মহাপুরুষ বিবেকানন্দ এই পৃথিবীতে সশরীরে বর্তমান ছিলেন, আজ তাঁহার কয়েক মুষ্টি ভস্মমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই গঙ্গার তীরে নির্জনে যে আলোকশিখা গত পাঁচ বৎসরকাল ধরিয়া জ্বলিতেছিল, আজ তাহা নির্বাপিত। যে কণ্ঠস্বর দেশে দেশান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল আজ তাহা নীরব। এক উদ্দাম ঝটিকার বেগে জীবন বিকশিত হইয়াছিল এই মহান আত্মার মধ্যে। কিন্তু সেই জীবনের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল শান্তির মধ্যে। সান্ধ্য-সঙ্গীত শেষ হইলে পরে মৃত্যুর আশীর্বাদ নামিয়া আসিল এক অমাবস্যা রজনীতে। ক্লান্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহভার তিনি রক্ষা করিলেন এবং ক্রমে মহাসমাধিতে বিলীন হইয়া গেল তাঁহার সেই বিজয়ী আত্মা।

সবেমাত্র তিনি কর্মসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে বিবেকানন্দের মৃত্যু হইল। আরো নূতন এবং বৃহত্তর কর্মের আহ্বান যখন আমার কর্ণে বাজিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইল। বিবেকানন্দ আসিয়াছিলেন মানুষ গড়িবার জন্য এবং সেই কার্যে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কী অমানুষিক পরিশ্রমই না তিনি

করিয়াছিলেন, এবং এই দুরূহ কার্যের জন্য তাঁহাকে পর্যায়ক্রমে আচার্য, পিতা এবং শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। মৃত্যুর দিনের অপরাহ্নটি পর্যন্ত তিনি এইভাবে ব্যয় করিয়াছিলেন।

কার্যে সিদ্ধিলাভ কিংবা নেতৃত্ব ইহার কোনটাতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। পাশ্চাত্যদেশে ধর্মপ্রচারের সময় বহু বিত্তশালী লোক তাঁহার বন্ধু হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে তাঁহাদের মধ্যে রাখিতে পারিলে কৃতার্থ বোধ করিতেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের বিলাসবহুল জীবনের প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বোধ করিতেন না। তাঁহার কাছে ভিক্ষুকের ছিন্নবাস, কলিকাতার স্বল্প-পরিসর রাস্তা এবং তাঁহার স্বদেশবাসীর অক্ষমতা সবচেয়ে প্রিয় ছিল। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা তাঁহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিল কেন? কেন সে-দেশের লোক তাঁহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ধর্ম-প্রচারকদের একজন বলিয়া সম্মান করিয়াছিল? তিনি তো ব্যক্তিগত কোন ধর্ম প্রচার করেন নাই। তিনি তো কোথাও বলেন নাই হিন্দু-ধর্মই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কিংবা আর সব ধর্ম নিকৃষ্ট। কিংবা কোন একটি বিশেষ মতবাদ তিনি জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন নাই। বরং এ কথা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া হিন্দুধর্ম গঙ্গোত্রীর নির্মল ধারার মতো প্রবাহিত হইয়াছিল এবং নিতান্ত বুদ্ধিজীবীরাও সেই ধারায় স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। উপনিষদ্ ছাড়া তিনি অন্য কোন শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃতি দিতেন না। বেদান্ত ভিন্ন তিনি অন্য কিছু প্রচার করিতেন না। মানুষের অন্তরে গিয়া প্রবিষ্ট হইত সেই বাণী, কারণ সেই বাণী আসিয়াছিল এমন একজন ধর্মাচার্যের নিকট হইতে যিনি সত্য প্রকাশে ভয় করিতেন না।

তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জানিতেন এক-সন্ন্যাসী-শ্রেষ্ঠ বলিয়া। তীব্র ত্যাগ ছিল সেই সন্ন্যাসের অবলম্বন এবং তাঁহার সকল উপদেশের মধ্যে সর্বদা প্রতিধ্বনিত হইত এই তীব্র বৈরাগ্য। একদা তিনি

বলিয়াছিলেন, "আমি যেন আমার গুরুর ন্যায় যথার্থ সন্ন্যাসীর মতো মৃত্যুকে বরণ করিতে পারি; কাঞ্চনে আসক্তি নাই, কামিনীতে আসক্তি নাই, যশে স্পৃহা নাই এবং এই তিনটির মধ্যে যশস্পৃহা হইল সর্বাপেক্ষা মারাত্মক।" এমন যে বৈরাগ্যবান পুরুষ, তাঁহার মধ্যে দেখিয়াছি একজন সতর্ক গৃহস্থকে—যে-গৃহস্থ সঞ্চয় করিতে ব্যস্ত, যে গৃহস্থ বস্তুর ব্যবহার শিখিতে এবং শিক্ষা দিতে আগ্রহবান এবং যাহার সকল কর্মপ্রচেষ্টা জীবনকে শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া গঠন করিতে ব্যগ্র। তাঁহার বৈরাগ্য এবং ত্যাগের মধ্যে তাই জীবনকে উপেক্ষা ছিল না।

বিবেকানন্দ একাধারে ছিলেন ভারতের শ্রেয়োধর্মী অধ্যাত্মধারণার মূর্ত বিগ্রহ ও একজন বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক। জাতীয়-জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁহার আবির্ভাব এবং তাঁহার কালে যে নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে, তিনি সেই যুগকে বরণ করিয়া লইতে দ্বিধা করেন নাই। ভারতের ঐতিহ্যে তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল এবং ইহার প্রাচীন রীতিনীতির তিনি ছিলেন একজন নৈষ্ঠিক পূজারী। ভারতের জাতীয়-জীবনের পরিণতি যেন তাঁহার মধ্যেই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিল এবং তিনি এক নূতন জীবন-বোধের সূচনা করিয়া উনবিংশ শতকের জাগরণকে অনেকাংশে সফলতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যেই যেন আমরা ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ বেদকে পাইয়াছিলাম। ভারতের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাঁহার মূল্য নির্ণীত হইবার সময় এখনো আসে নাই। কারণ ধর্ম হইল জীবন্ত বীজের সমান, সেই বীজ তিনি সবেমাত্র বপন করিয়া দিয়াছেন, ফসল তুলিবার সময় এখনো আসে নাই।

কিন্তু একমাত্র মৃত্যুর ভিতর দিয়াই আমরা দেশ-প্রেমিককে পাইয়া থাকি। আজ তিনি যখন তাঁহার শিষ্যদের মধ্য হইতে চলিয়া গিয়াছেন, যখন শ্মশানে তাঁহার সমালোচকদের কণ্ঠ স্তব্ধ হইয়া

গিয়াছে, তখনই শুনি সেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর যাহার ভিতর দিয়া স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল এবং সমগ্র জাতি এক মন হইয়া যাহা শুনিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা এমন একটি মনের পরিচয় পাই যাহা পৃথিবীর নানা দেশের নানা লোকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার অসাধারণ সুযোগ পাইয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য—দুই-ই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়াছেন এবং সর্বত্রই উচ্চ, এবং নীচ সকলের দ্বারাই তিনি সম্বর্ধিত হইয়াছেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি যাহা কিছু দেখিত, তাহারই মর্মে প্রবেশ করিত। কতবার না তিনি বলিয়াছিলেন—"আমেরিকাবাসীরা শূদ্রের সমস্যা সমাধান করিবে—কিন্তু তাহার জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইবে।" কিন্তু পরবর্তীকালে দ্বিতীয়বার যখন তিনি পাশ্চাত্ত্যদেশ ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহার এই মতের পরিবর্তন হয় এবং তিনি পাশ্চাত্ত্যের অপরিসীম ধনলুব্ধতা ও বৈশ্যপ্রবৃত্তির কঠোর নিন্দা করিয়া বলেন যে, উহার তুলনায় এশিয়াবাসীদের নৈতিক মানদণ্ড যথেষ্ট উন্নত। তাঁহার নিকট প্রত্যেক জাতির মহত্ত্ব স্বীকৃত হইত এবং তিনি বলিতেন যে, সেই মহত্ত্বের আলোকেই সেই জাতিকে চিনিয়া লইতে হইবে। তেমনি ভারতবর্ষকে চিনিতে এবং বুঝিতে হইলে, স্বামীজী বলিতেন, ভারতের যুগযুগান্তরের মহত্ত্বের ইতিহাস জানিতে হইবে। দরিদ্র, সর্বরিক্ত, পরাধীন ভারত চিরকাল কিন্তু পরাধীন ছিল না, এবং চিরকাল উহা পরাধীন থাকিবেও না। কিন্তু ইহার যাহা কিছু মহত্ত্ব তাহা ভারতের সকল অবস্থার মধ্যেই অটুট রহিয়াছে। কী সেই মহত্ত্ব যাহার জন্য ভারত সারা এশিয়ার মুকুটমণি, তাহার দিকে বার বার অঙ্গুলি-সংকেত করিয়া স্বামীজী বলিতেন, ভারতবাসীকে যদি প্রাচীন যুগের সহিত নবীন যুগের সমন্বয় সাধন করিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগকে ভারতের চিরন্তন মহত্ত্ব সম্পর্কে সজাগ হইতে হইবে। তাঁহার দেশবাসীর জন্য বিবেকানন্দ কী ভবিষ্যদ্বাণী রাখিয়া

তেমনি। ভারতের স্থান এখানে পৃথিবীর শীর্ষদেশে—এ কথা আমি হিমালয়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সগর্বে ঘোষণা করে বলতে পারি।”

ভারতবর্ষের সব-কিছুই বিবেকানন্দের চক্ষে মহিমামণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া উঠিত। ইহার জনগণের দুঃখ-দৈন্য ও দারিদ্র্যে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইতেন না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে আমি উল্লেখ করিব। একবার জাহাজে এক ইংরেজ ভদ্রলোক ভারতবর্ষের পুরাণ সম্পর্কে একটি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেন। স্বামীজী এমন প্রচণ্ড যুক্তি সহকারে তাহার প্রতিবাদ করিলেন যে, তাহা দেখিয়া ভদ্রলোক রীতিমত অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। সেই সময়ে ভারতের পুরাণাদি শাস্ত্র, ইহার প্রাচীন বেদ ও উপনিষদ্ সম্পর্কে তিনি এমন সারগর্ভ আলোচনা করিলেন যাহা শুনিবার পর সেই বিদ্রূপকারী ইংরেজ একেবারে নিরুত্তর হইয়া গেলেন। ভারতের স্বার্থে যে কেহ আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, স্বামীজী নির্মম চিত্তে তাহাকেই প্রতি-আঘাত হানিয়াছেন। সে যদি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুও হইত তাহা হইলেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। ভারতের সব কিছুই তাঁহার আছে চিরন্তন, পবিত্র। তাই না তিনি বলিতেন—“ঈশ্বরে যাঁহারা পৌঁছাইতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই ভারতবর্ষের নিকট শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আধ্যাত্মিক মহিমার চির-পুণ্যক্ষেত্র এই প্রাচীন দেশ।” এইজন্যই তিনি তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যদিগকে বলিতেন—“যদি তোমরা ভারতবর্ষকে ভালবাস, তাহা হইলে ইহার সব কিছুকেই ভালবাসিতে হইবে, তোমাদের খুশীমত ভালবাসিলে চলিবে না।”

ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিবেকানন্দ ভারতের শিবকে উপলব্ধি করিতেন, তাহাদের ব্যথা তাঁহার বক্ষে ভীষণভাবে বাজিত, তাহাদের দুঃখে তিনি অশ্রুবিসর্জন করিতেন। পাশ্চাত্ত্যের ভোগবিলাসের শ্রেষ্ঠতম জিনিস তাঁহার চরণে অর্ঘ্যের মত প্রদত্ত

গিয়াছেন? মৃত্যুকালে যে গৈরিকবাস তিনি পিছনে ফেলিয়া গিয়াছেন, জাতীয় কোন্ বৈশিষ্ট্যে সন্ন্যাসী তাঁর সেই বস্ত্র রাঙাইয়া লইয়াছিলেন? দণ্ডের উপর সেই বস্ত্রকে পতাকা করিয়া আজ আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে। বিবেকানন্দ ছিলেন সেই মানুষ যে মানুষ জীবনে অকৃতকার্যতা কাহাকে বলে তাহা জানে না। আজীবন তিনি ছিলেন শক্তিমন্ত্রের অভীঃমন্ত্রের উপাসক। নেতিবাচক কোন কিছুই তাঁহার চিন্তার পরিমণ্ডলে থাকিতে পারিত না। উচ্ছ্বাস বা ভাবপ্রবণতা ছিল তাঁহার চরিত্র হইতে সুদূরতম জিনিস। কাহারো কর্তৃত্বই তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না—এ হেন প্রচণ্ড রজোগুণের আধার ছিলেন তিনি। একমাত্র আচার্যের ভূমিকা ভিন্ন অন্য কোনভাবেই তিনি কোন বিদেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, এমনই তীব্র ও তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর স্বাজাত্যাভিমান। আমার এক ইংরেজ বন্ধু, যিনি স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, আমাকে একবার বলিয়াছিলেন, "স্বামীজীর যাহা কিছু প্রতিভা, তাহা তাঁহার মর্যাদাবোধের মধ্যেই নিহিত। রাজকীয় মহিমায় দীপ্ত সেই মর্যাদাবোধ।"

স্বামী বিবেকানন্দ, রামমোহন রায়ের মত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের নিকট আসিবে চাটুকার হিসাবে নহে, ভৃত্য হিসাবে নহে, আসিবে আচার্য হিসাবে, গুরু হিসাবে, শিক্ষক হিসাবে। সেই যোগ্যতা তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। তিনি কখনও কাহারও নিকট তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পতাকা অবনমিত করেন নাই। কতবার না তিনি গভীর ঘৃণার সহিত মন্তব্য করিয়াছেন—"ইংরেজ আমাদের ধর্মের বিষয় শিক্ষা দেবে। গোষ্পদে সমুদ্র যেমন, আধ্যাত্মিক বিষয়ে ইংরেজদের ধ্যান-ধারণাও

হইয়াছিল, তথাপি তিনি সেই সরল অকিঞ্চন হিন্দু-সন্ন্যাসীই ছিলেন এবং তাহাতেই তিনি গর্ববোধ করিতেন। তাঁহার জীবনযাত্রার সরলতা তাঁহার চরিত্রকে এক নিরুপম মাধুর্য প্রদান করিয়াছিল। সরলচিত্ত ছিলেন বলিয়া তিনি দুর্বলচিত্তের মানুষ ছিলেন না। সকল রকম দুর্বলতাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। সেইজন্য তিনি তাঁহার জাতির জন্য, জাতির প্রত্যেকটি লোকের জন্য একটি মন্ত্রই রাখিয়া গিয়াছেন—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্নিবোধত।"